মহালয়ার আতঙ্ক

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

১৯৩৭— ২০২০

স্ত্রী শ্রাবণীর সঙ্গে কবি প্রণবকুমার

কন্যা টুপুরকে নিয়ে প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

মহালয়ার আতঙ্ক

অঙ্কন: কৃষ্ণেন্দু চাকী

মহালয়ার জাতক

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রয়াত কবি প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতি-তর্পণে
১ জুন ২০২০ তাঁর পারলৌকিক ক্রিয়ার দিন
'হরপ্পা'-র পক্ষ থেকে প্রকাশিত হল বৈদ্যুতিন পুস্তিকা
'মহালয়ার জাতক'।

প্রচ্ছদ ও শিল্পনির্দেশনা
সোমনাথ ঘোষ

অলংকরণ
কৃষ্ণেন্দু চাকী ও দেবাশীষ দেব

বিশেষ সহযোগিতা
রজতেন্দ্র ও সৌম্যদীপ

সম্পাদক
সৈকত মুখোপাধ্যায়

http://harappa.co.in/
harappamagazine@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/harappalikhanchitran/

সস্ত্রীক প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

দুই দরোজার মাঝখানে এই পুরনো ঘর
তার মানে কি জন্ম-মৃত্যু? তার মানে কি
মুঠোর মধ্যে ধরে-রাখা অলীক প্রহর?

কবি প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায় এই অনিশ্চয়তা নিয়ে জীবন কাটিয়েছেন বহু দিন, জীবনের শেষ এক মাস তো বিশেষ করে। শারীরিক সমস্যা তখন তাঁকে আরও অস্থির করে তুলেছিল, বারংবার হাসপাতাল-ঘর করেও রোগের হাত থেকে পরিত্রাণ

পাচ্ছিলেন না কিছুতেই। সুস্থতার আশ্বাস বড়োই ক্ষণস্থায়ী হয়েছিল সেসময়, ঠিক তাঁর জীবনে সুখ যেমন ক্ষণিকের অতিথি ছিল, দুঃখের নিত্যতাসূত্রে। শেষবার বাড়ি ফেরার পর যখন আমফান ঝড়ের তাণ্ডবে চারপাশে সকলে দিশাহারা তখন তিনি বোধহয় শুনতে পাচ্ছিলেন অশেষের ডাক:

হাওয়া এসে শুনিয়ে যায় অচেনা স্বর।
চমকে উঠে চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখি
বিশাল কালো স্তব্ধ আকাশ মাথার উপর।

তারপর এক সময় ঝড় থেমে যায়, থেমে যায় প্রকৃতির প্রলয় নাচন। নিষ্প্রদীপ অবরুদ্ধ কলকাতা যখন তাণ্ডবের পর স্বাভাবিক হতে লড়াই চালাচ্ছে ঠিক তখনই থেমে গেল কবি প্রণবকুমারের যাবতীয় যুদ্ধ, ভেঙে পড়ল রোগের বিরুদ্ধে যাবতীয় প্রতিরোধ। সেদিনটা ছিল ২২ মে ২০২০।

১৯৩৭-এর মহালয়া তিথিতে জন্ম পাঁচের দশকের এই বলিষ্ঠ কবির। তাঁর জন্ম-বেড়ে ওঠা-শিক্ষা-কর্মজীবন—সব কিছু কলকাতাতেই। মামাবাড়িতে অগ্রজ কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও দেবদাস পাঠকের প্রভাবেই তাঁর লেখালেখির সূত্রপাত খুব কম বয়সেই। পরবর্তীকালে কৃত্তিবাস-গোষ্ঠীর অন্যতম প্রণবকুমার 'দেশ' পত্রিকাসহ লিখেছেন দুই বাংলার ছোটোবড়ো বহু পত্রপত্রিকায়। কৃত্তিবাস থেকে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *অতলান্ত* (মাঘ ১৩৬১)। এরপর প্রকাশিত হয় *এসো, হাত ধরো* (আনন্দ, ডিসেম্বর, ১৯৭৭), *অপেক্ষার রঙ* (আনন্দ, জ্যৈষ্ঠ ১৪০০), *জল, তবু দগ্ধ-করা* (প্রতিভাস, ২৫ বৈশাখ ১৪১২), *শো-কেসের ফুলবাবু* (গাঙচিল, বইমেলা ২০০৭), *এত মায়া,*

এত মোহ (পত্রলেখা, মহালয়া ১৪১৪), *কেমন আছে এই পৃথিবী* (সিগনেট প্রেস, জানুয়ারি ২০১৫)। তাঁর সুদীর্ঘ কবিজীবনে রচিত গ্রন্থিত ও অগ্রন্থিত কাব্যকৃতি দুই মলাটের ভিতর সংকলিত হয়েছে ২০১৭-তে তাঁর আশি বছরের জন্মদিনে সিগনেট প্রেস প্রকাশিত *কবিতা সমগ্র*-এ। পরবর্তী কালে দেজ থেকে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর *শ্রেষ্ঠ কবিতা* (২০১৯)। বিষ্ণু দে পুরস্কার, রূপসী বাংলা পুরস্কার, বাংলা আকাদেমি পুরস্কার এবং জীবনানন্দ দাশ সম্মান-এ পুরস্কৃত হয়েছেন তিনি।

চাকরিজীবনে উচ্চপদে থাকার পাশাপাশি তিনি যেমন কাব্যচর্চা চালিয়ে গেছেন তেমনই করেছেন সার্থক সম্পাদনার কাজ, *টেনিদা সমগ্র* তার অন্যতম উদাহরণ। 'সত্যসন্ধ' ছদ্মনামে 'ধাঁধা', 'মজারু' ছদ্মনামে 'মজার খেলা', 'স্মৃতিধর' ছদ্মনামে 'পড়ুয়ার পাঠশালা', 'সাংখ্যায়ন' ছদ্মনামে 'বুদ্ধির্যস্য'-র মতো নানা জনপ্রিয় সৃজন তিনি করেছেন। 'দেশ' পত্রিকায় সংগীত-সমালোচনা, পুস্তক-সমালোচনা করেছেন নিয়মিত। সুচারু গদ্যে রচনা করেছেন আনন্দ পাবলিশার্সের বইয়ের ব্লার্ব ও বিজ্ঞাপন। অংশ নিয়েছেন রেডিয়োতেও। বিশেষ আগ্রহী ছিলেন জাদুচর্চা নিয়ে। আর রবীন্দ্রনাথের গান ছিল তাঁর প্রাণের আরাম, মানসিক শক্তির উৎস।

ছন্দকুশল অনুভূতিশীল কবি প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার আলাপ ২০১৪-র শেষদিকে একটি গদ্য রচনার অনুরোধ নিয়ে। অল্পদিনের পরিচয়ে কী করে অসম বয়সি আমরা কাছাকাছি চলে এসেছিলাম সে-কথা আলোচনা করার সময় বা স্থান বোধহয় এটা নয়। মূলত লেখালেখির ব্যাপারে তাঁর কাছে

আমার দাবি থাকত গদ্য রচনার, যা তিনি দ্রুত নাকচ করতেন নিজের কবিসত্তার দোহাই দিয়ে। চলত নিরন্তর টানাপোড়েন, তাই নিমরাজি হয়েও তাঁকে বার কয়েক সাড়া দিতে হয়েছে আমার নাছোড় আবদারে। তবে দ্রুত সাহিত্যচর্চার বাইরেও নানাভাবে তাঁর সঙ্গে গড়ে উঠেছিল এক আত্মিক বন্ধন।

এই সখ্যের সুবাদেই 'হরপ্পা লিখন চিত্রণ'-এর সঙ্গে প্রণবকুমারের সম্পর্কটা সেই পত্রিকা-প্রকাশের পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি পর্ব থেকেই। তিনি ছিলেন পত্রিকার পরম শুভাকাঙ্ক্ষী ও আপনার জন। নানা পরিকল্পনা রূপায়ণে তাঁর প্রত্যক্ষ সহযোগিতা থেকে 'হরপ্পা' কোনোদিন বঞ্চিত হয়নি।

আজ ১ জুন ২০২০ কবি প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়ের পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন হবে। এই বিশেষ দিনে প্রকাশিত 'মহালয়ার জাতক' পুস্তিকাটি তাঁর প্রতি 'হরপ্পা'র আন্তরিক শ্রদ্ধা তর্পণ। সদ্য প্রয়াত কবি প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়ের দীর্ঘদিনের সহচর, পুত্রপ্রতিম শ্রীসুব্রত গুহ (যিনি সব বাধাবিঘ্ন ঝড়ঝঞ্ঝা উপেক্ষা করে গত মাসাধিককাল কবিকে সুস্থ করে তুলতে নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে গেছেন) যখন তাঁর পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করবেন, তখন আসুন আমরা কবিকে শ্রদ্ধা জানাই তাঁর অতি প্রিয় রবীন্দ্রনাথের গানের কোনো কলি গুনগুনিয়ে...

—সৈকত মুখোপাধ্যায়

তবু কবিতা	১৫	প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়
প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায় ও অন্য কয়েকজন	৩৯	হীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
রবীন্দ্রসংগীতের মতোই প্রণবকুমারের জীবন, তানালাপ বর্জিত ও সুঠাম	৪৯	সুধীর চক্রবর্তী
গভীর বেদনায়, সুখের স্মৃতিতে	৬৯	বিভাস চক্রবর্তী
প্রণবদা	৭২	দেবাশীষ দেব
প্রণবদা	৭৫	কৃষ্ণেন্দু চাকী
প্রণবদার জাদুপ্রীতি	৮৩	দীপক রায়চৌধুরী
কবিতা, আমি ও প্রণবকুমার	৯৩	রজতেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

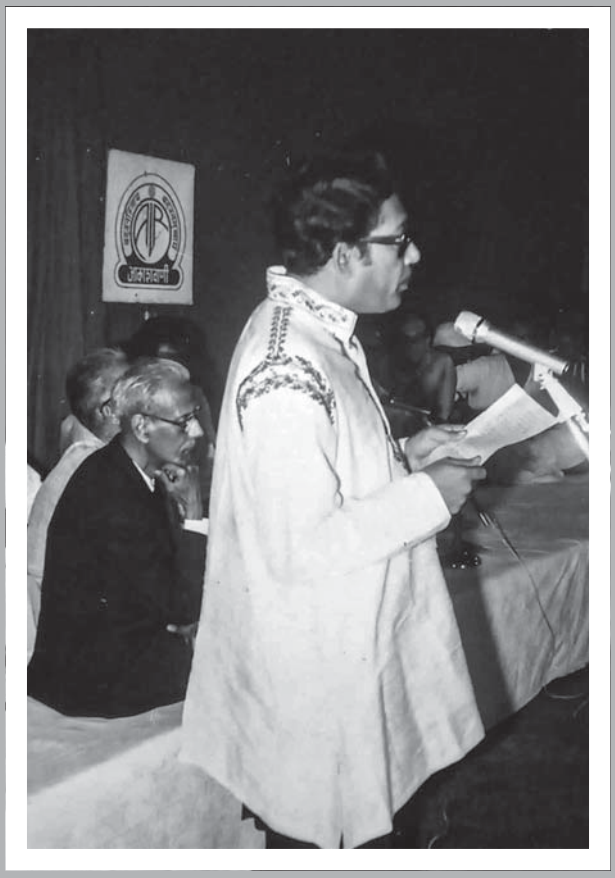

পাঠরত কবি প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

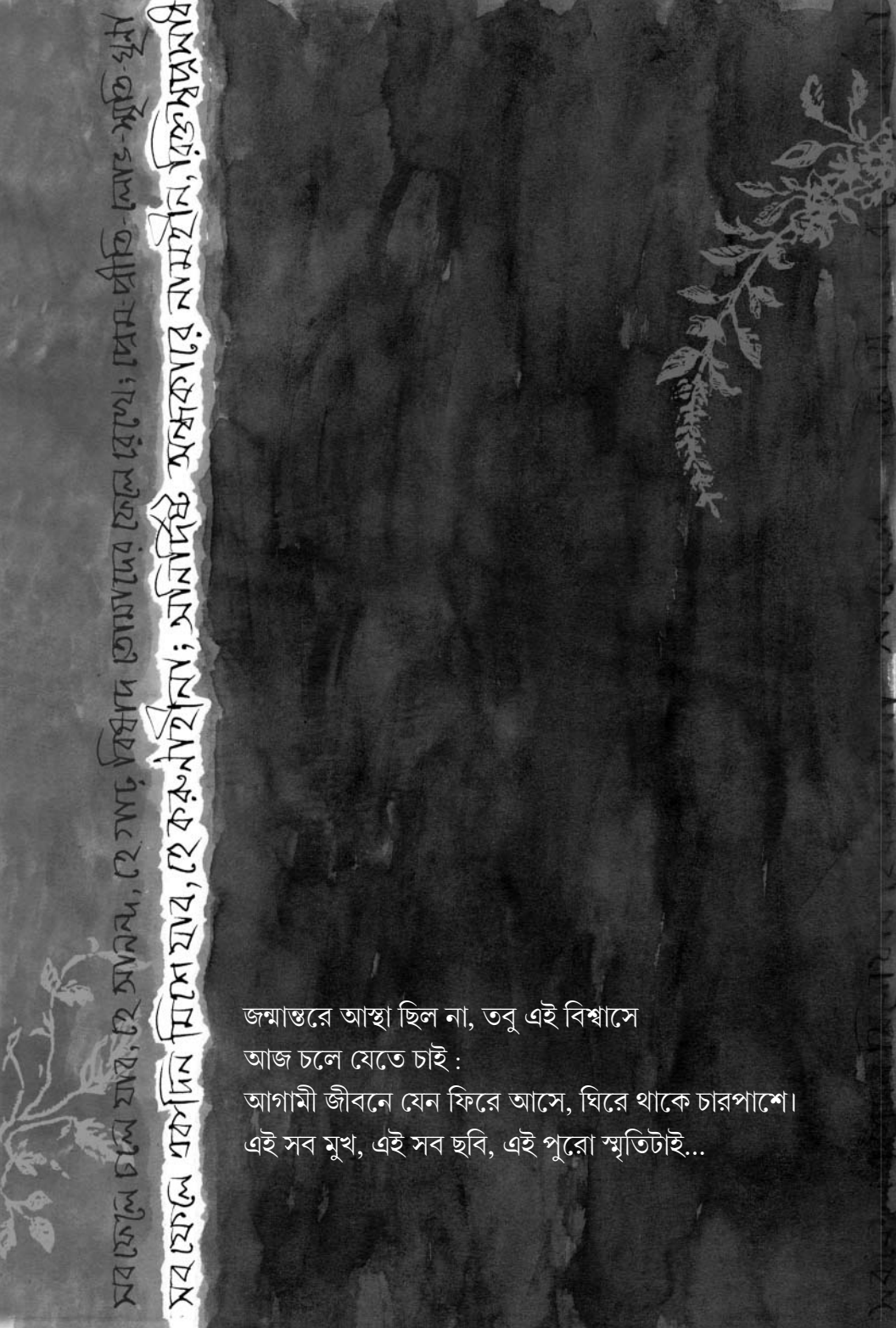

জন্মান্তরে আস্থা ছিল না, তবু এই বিশ্বাসে
আজ চলে যেতে চাই :
আগামী জীবনে যেন ফিরে আসে, ঘিরে থাকে চারপাশে।
এই সব মুখ, এই সব ছবি, এই পুরো স্মৃতিটাই...

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

(১৯৩৭-২০২০)

তবু কবিতা

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

মনুমেন্টের সামনে থেকে একটা বাস ছাড়ত তখন। ৩২-সি। বাঘ-মার্কা সরকারি বাস। শ্রদ্ধানন্দ পার্কের গা ঘেঁষে দক্ষিণেশ্বরের দিকে চলে যেত বাসটা। ১৯৫৬ সালের কথা বলছি।

শীতকাল। সন্ধের মুখ। দুপুরে এক বন্ধুর সঙ্গে চৌরঙ্গিপাড়ায় সিনেমা দেখেছি। তাকে ছেড়ে দিয়ে মনুমেন্টের সামনে এসে বাসস্টপে দাঁড়িয়েছি। বাস নেই। এক ঝালমুড়ি-অলার কাছ থেকে এক আনার মুড়ি কিনে একটা-দুটো করে মুখে দিচ্ছি।

বাসস্টপে লোক বেশ কম। ছুটির দিন ছিল বোধ হয়। ঠিক মনে পড়ছে না। পকেটে প্রাইভেট টিউশনির সাতাশটা টাকা। তিরিশ পেতাম। তিন টাকা সেদিনই দুপুরে খরচ হয়েছে। কটস-উলের শার্টের বুকপকেটে পেন, ভেতরের পকেটে টাকাটা। নীচের দু-পাশের পকেটে রাজ্যের কাগজ। তখন ধুতি পরতাম। বঙ্গবাসী কলেজের ছাত্র, ইউনিয়ন করি, কবি হিসেবে অল্পস্বল্প পরিচিতিও ঘটে গেছে। বেশ কয়েকটা কবি-সম্মেলনেও গিয়েছি। তেমনই একটি কবি-সম্মেলনের চিঠি ছিল পাশের পকেটে। শিবপুর বি-ই কলেজের শতবার্ষিকী। সেই উপলক্ষে কবি-সম্মেলনের নেমন্তন্ন। পরমেশ ধর (কবি) তখন ওই কলেজের ছাত্র, ওরই মুখ্য উদ্যোগে কবি-সম্মেলন। টাটকা চিঠিটা পকেটেই ছিল।

বাস নেই। মুড়ি চিবোচ্ছি দাঁতে, হঠাৎ এক দীর্ঘকায়, সুঠাম, মাঝবয়সী স্বাস্থ্যবান লোক সামনে এসে দাঁড়াল। পরিষ্কার গলায় ইংরেজি-হিন্দি মেশানো ভাষায় প্রশ্ন করল, আচ্ছা, আপনি কি কোনো কলেজে পড়েন?

প্রশ্নের কারণ বুঝতে না পেরে জবাবে বললাম, হ্যাঁ। কেন বলুন তো?

লোকটি তখন বলল, পাটনায় থাকি আমি। পেনের ব্যবসা করি। কলকাতায় এসেছি। ইচ্ছে রয়েছে, কলেজগুলোতে ঘুরে-ঘুরে পেন বিক্রি করব। কিন্তু অচেনা শহর। আপনি যদি আপনাদের কলেজের ব্যাপারে কোনো সাহায্য করতে পারেন—

আমাদের কলেজে তখন ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে চিপস্টোর খোলা হয়েছে। কম দামে খাতা-বই, টুকিটাকি জিনিসপত্র দেওয়া হয়। আরও দু-একটা কলেজেও রয়েছে

চিপস্টোর। সেখানে অনায়াসেই পেন চলতে পারে। আমার মাথায় খেলে গেল ব্যাপারটা। উৎসাহিত হয়ে বললাম, কোনো অসুবিধে নেই। কী পেন আপনার? কী রকম দাম? কমিশন কত? ইত্যাদি নানান প্রশ্ন একের-পর-এক করে যেতে লাগলাম। ইতিমধ্যে একটি বাস বোধ হয় এসে ছেড়ে গেছে। খেয়াল করিনি। এ-ও খেয়াল করিনি যে, কথা বলার ঝোঁকে কখন থেকে যেন লোকটি এক-পা দু-পা করে এগিয়ে চলেছে। আমিও পাশাপাশি হেঁটে চলেছি।

হঠাৎ খেয়াল হল। লোকটি আচমকা প্রশ্ন করল, আপনার পকেটে ওটা কী পেন? উত্তর দেবার আগেই দেখি, বুকপকেট থেকে উঁকি-মারা পৈতেয়-পাওয়া শেফার্স পেনটি লোকটি তুলে নিয়েছে হাতে। তারপর বলল, আর কী রয়েছে পকেটে? চটপট দেখি। তীক্ষ্ণ শীতল কণ্ঠ। বিনীত ভঙ্গিটি একেবারে অদৃশ্য। আদেশের সুর।।

বাসস্টপ থেকে অনেকটা দূরে চলে এসেছি। একেবারে নির্জন চারপাশ। আমি স্তম্ভিত। আড়ষ্ট কাঠ। শুকনো তালুতে জিভ ঠেকিয়ে চেঁচাতে চাইলাম— চোর, জোচ্চোর।

লোকটির দৃঢ় হাত আমার ঠোঁটের ওপর এসে পড়ল। আর সেই মুহূর্তে ময়দানের অন্ধকার ঘাস আর গাছের আড়াল ফুঁড়ে হাজির হল আরও দু-জন লোক। একজনের হাতে বোধ হয় টর্চও ছিল।

তিনজনে ঘিরে ফেলেছে আমায়। আমার শেফার্স পেনটি তখনো লোকটার বাঁ হাতে ধরা।

পরিষ্কার বাংলায় নবাগতদের একজন বলল, কী হয়েছে?

লোকটা বলল, এই ছেলেটা আমার পেন ছিনতাই করছিল। আমি একটুক্ষণের জন্য ভরসা পেয়েছি তখন। কান্নাভাঙা গলায় বললাম, না-না, বিশ্বাস করুন, ওটা আমার পেন। ওই লোকটাই—কথা শেষ হল না। বাঙালি লোকটি ততক্ষণে আমার পাশ-পকেটে হাত ঢুকিয়ে যাবতীয় কাগজপত্র বার করতে শুরু করেছে। আর মুখে বলে চলেছে, ছি-ছি, ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে এইসব করা।

আমি ততক্ষণে বুঝে গেছি, তিনজনে একই দলের। এর পরেই ভেতরের পকেটের সাতাশটা টাকা তুলে নেবে ওরা। পকেটের কাগজপত্রগুলো আঁতিপাঁতি করে খুলে-খুলে দেখছে বাঙালি লোকটা। অবর্ণনীয় মুহূর্ত কাটছে। প্রতিটি খাম খুলে-খুলে দেখছে, কোথাও টাকা পয়সা লুকনো রয়েছে কি না। বি-ই কলেজের কবি-সম্মেলনের কার্ডটা যখন টর্চ ফেলে দেখছে লোকটা, তখন আমি মরিয়া হয়ে চেঁচিয়ে উঠেছি, ওটা দিন আমায়। ওর মধ্যে কিছু নেই।

তখন কি জানতাম, ওর মধ্যেই সব ছিল?

কার্ডটার ওপর চোখ বোলানো শেষ করে লোকটা খামটা দেখল। দেখল আমার নাম। তারপর প্রশ্ন করল এ চিঠিটা কার?

আমি জবাব দেব না। দাঁতে দাঁত চেপে দাঁড়িয়ে থাকলাম। নাম পর্যন্ত জেনে গেল লোকটা। তখন আমার অন্যরকম ভয়। থানা-পুলিশ-হাজত ঘুরছে মাথায়, চোখে ভাসছে বাড়ির সব কটি মুখ, বন্ধু-বান্ধবদের।

লোকটির গলা কখন যেন নরম হয়ে গেছে। আমাকে বলছে, আপনি কবিতা লেখেন? তারাপদ রায় বলে কাউকে চেনেন?

তারাপদ রায়। আমি নিজের কানকে তখন অবিশ্বাস করছি। টাঙ্গাইলের ছেলে, নতুন এসেছে, মৌলানা আজাদে পড়ে। 'পূর্বমেঘ' বলে একটা কাগজ চালায়। কবিতার কাগজ। সে-ও এই দলের।

বিস্ময় কখন পালটা প্রশ্ন হয়ে গেছে খেয়াল করিনি। বলে উঠেছি, কোন্ তারাপদ? ডেকার্স লেনে থাকে? সে-ও আপনাদের দলে!

জোঁকের মুখে নুন পড়ল যেন। শেফার্স পেনটা এক ঝটকায় কেড়ে নিয়ে পাটনার লোকটিকে গলায় ধাক্কা মেরে ময়দানের গাঢ়তর অন্ধকারে ঠেলে দিল বাঙালি লোকটি। মুখে অকথ্য খিস্তি।

তারপর আমার হাতে পেনটা তুলে দিয়ে বলল, খুব বেঁচে গেলেন আজ। ও লোকটা নামকরা গুণ্ডা। ইডেনে কদিন আগে বিরাট ছিনতাই করেছে! আপনাকে বাসে তুলে দিই। হ্যাঁ, আরেকটা কথা, তারাপদবাবুকে যেন বলবেন না এই ঘটনাটা। চা খাবেন?

আমার মাথায় একটি বর্ণও ঢুকছে না। কী হল, কেন হল, ভাবতে গিয়ে সব-কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে। চা খাব না, কিন্তু তারাপদকে আজই ধরব। লোকটি তখনও কাকুতিমিনতি করে বুঝিয়ে যাচ্ছে, তারাপদকে যেন না বলি। এসব ঘটনায় আমারও মুখে চুনকালি পড়বে।

বাসে উঠে সেই রাত্রেই ফের নেমে গেছি। সোজা তারাপদর বাড়িতে। ডেকার্স লেন তো সামান্যই দুরে। তারাপদকে কীভাবে কী বলেছি মনে নেই। তবে এ ব্যাপারটা নিয়ে বন্ধুমহলে বেশ কিছুদিন ধরে একটা গল্পই চালু হয়ে গিয়েছিল।

আসল ব্যাপার, তারাপদ তখন থাকত মেসোমশাইয়ের বাড়িতে। মেসোমশাই হলেন স্বনামধন্য দেবী রায়। সেই সূত্রে পুলিশের অনেকেই তারাপদকে চেনে। ময়দান-ডিউটিতে সে-রাত্রে যে দুজন ছিল তাদেরই একজন সেই বাঙালি লোকটি। তারাপদ মেসোমশাইকে বলে দিলে, ফল যে খুব সুখের হবে না, বুঝতে পেরে গিয়েছিল পুলিশটি। তাই এত অনুনয়, এত কাকুতিমিনতি। তারাপদ, আপনার মনে পড়ছে? আপনি অবশ্য হো-হো করে হেসেছিলেন। আরও রসালো করে মজাদার করে ঘটনাটা বলেও ছিলেন অনেকদিন। কফিহাউসে, কৃত্তিবাসের আড্ডায়, কবিসম্মেলনে যাবার বাসে, এখানে সেখানে। মনে পড়ছে?

আমি কিন্তু আজীবন মনে রাখব ঘটনাটা। কবিতা আমাকে সেদিনই শুধু বাঁচায়নি, বাঁচিয়েছে আরও অনেকবার, অনেকদিন। বহু অপ্রস্তুত মুহূর্তে, বহু বিহ্বল অপমানে, বহু গ্লানিময় পরাজয়ে, বহু নির্দয় শোকে, নিষ্করুণ আঘাতে, নিরুদ্দেশ অস্থিরতায়, নির্জীব একাকিত্বে, নিষ্ফল প্রয়াসে, নির্মম ঔদাসীন্যে, নিশ্চল স্থবিরতায় হঠাৎ এসে উদ্ধার করেছে আমায় কবিতা। আমি তাকে ভুলে থেকেছি অনেকবার। সে আমায় ভোলেনি। কখন যেন কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, মাথায় বুলিয়েছে শুশ্রূষার আঙুল, নিদ্রাহীন চোখে মাখিয়েছে মায়াবী অঞ্জন, শব্দের পর শব্দ গিয়েছে যুগিয়ে। নতুন সৃষ্টির দিকে তাকিয়ে আমি ভুলে গিয়েছি সব অপমান, অস্থিরতা, শোক, পরাজয়, আঘাত, স্থবিরতা, ঔদাসীন্য, একাকিত্ব।

কবিতা আমার প্রথম ও শেষ প্রেমিকা। আমার তৃষ্ণা, বাসনা, নিশ্বাস। আমার নিয়তি।

দুই

২৪বি নূর মহম্মদ লেন, কলিকাতা-৯—এই ঠিকানাটা লিখতে গিয়ে এখনো এক-ধরনের রোমাঞ্চ হয়, বুক ছলকে ওঠে। আমার আদিতম রচনার সময় থেকে শুরু করে চাকরি জীবনের গোড়ার দিক পর্যন্ত যাবতীয় লেখার তলায় ব্যবহার করতে হয়েছে এই ঠিকানাটা। অথচ এটা আমার নিজের বাড়ির ঠিকানা নয়, মামাবাড়ির। আরও দু-জন লেখক বহুকাল পর্যন্ত এই ঠিকানাতেই পরিচিত ছিলেন পত্রিকা ও সাহিত্যিক-মহলে। একজন নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, অন্যজন দেবদাস পাঠক। প্রথম জন আমার বড়োমামার বড়োছেলে, দ্বিতীয় জন মেজমাসীর ছোটোছেলে। এ দু-জনকে আমি দাদা আর রাঙাদা বলি।

আমাদের কৈশোরেই দাদা নাম-করা কবি। নুর মহম্মদ লেনে দাদার বন্ধুবান্ধব যাঁরা আসতেন, তাঁরা সকলেই বিখ্যাত লেখক। রাঙাদা ওই বাড়িতে থেকেই পড়াশুনা করেছে। চাকরিজীবনের শুরুর কয়েকটা বছর কাটিয়ে গেছে। ওই বাড়িতে থেকেই কবিতা-গল্প লিখে নাম করেছে।

আমার বাল্য ও কৈশোর কেটেছে দু-রকম পরিবেশে। জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই দেখেছি নিত্য অশান্তিময় এক পারিবারিক পরিবেশ। পড়াশোনার অনুকূল আবহাওয়া ছিল না আমার পিতৃগৃহে। মাঝে-মাঝেই মামাবাড়িতে চলে আসতাম আমরা। একেবারে উলটো পরিবেশ সেখানে। প্রচুর বই, পত্র-পত্রিকা, গ্রন্থাবলী, সাহিত্য নিয়ে তর্ক-বিতর্ক, রবীন্দ্রনাথের গান। যেমন খুশি পড়ো, লেখো, গান গাও, আঁকো, আবৃত্তি করো, উৎসাহদাতার অভাব নেই।

মামাবাড়ির এই পরিবেশ আমাকে ছোটোবেলা থেকেই গভীরভাবে আচ্ছন্ন করেছিল। 'ঊষা' নামে একটি দৈনিক কাগজ আসত মামাবাড়িতে। আমরা প্রায় সমবয়সী তিনজন—আমি, বড়োমামার মেয়ে প্রতিমা (সুন্দরদি বলি আমি), আর মেজোমামার ছেলে শ্যামল (এখন আনন্দবাজার পত্রিকার সাংবাদিক)—সভ্য হয়ে গেলাম 'ঊষা'র কিশোরবিভাগে। ভেবে-ভেবে নানান উদ্ভট প্রশ্ন পাঠাই তিনজনে। উত্তর ছাপা হয়, সেই সঙ্গে আমাদের নাম এবং সভ্য-নম্বর। কী যে রোমাঞ্চ ছিল ছাপার অক্ষরে নিজেদের নাম দেখার। এই 'ঊষা' পত্রিকাতেই হঠাৎ খেয়ালে পাঠিয়ে দিলাম এক জ্বালাময়ী পদ্য। আমার প্রথম অপচেষ্টা। ছেচল্লিশের দাঙ্গা নিয়ে লেখা সমিল এক ছেলেমানুষি। তখন পড়ি ক্লাস সিকসে। মাস কয়েক বাদে এক দুপুরে হাজির এক সাইকেল-পিওন। আমার নাম ধরে খোঁজাখুঁজি করছে। আমি ভয়ে কাঁপছি তখন, ইস্কুলের কানে নালিশটালিশ যদি হয়। অবশেষে জানা গেল, 'ঊষা'-তে ছাপা হয়েছে সেই রচনাটি। লেখকের নামে কমপ্লিমেন্টারি কপি এসেছে। সেই শুরু। সে কী উত্তেজনা, সে কী ভয়। ভাষায় বোঝাতে পারব না। হাজারবার ধরে নাম দেখেছি, দেখিয়েছি হাজারো জনকে। শুধু দেখাইনি নিজের বাড়িতে। মার খাবার ভয় ছিল। ইস্কুল ম্যাগাজিনেও কিছু লেখা ছাপা হয়েছে এর পর। কিন্তু সবই লুকিয়ে রাখতে হত বাবার চোখের আড়াল থেকে। অতৃপ্ত ও অচরিতার্থ যে-ইচ্ছেগুলো তখন কালির আঁচড়ে অক্ষর হয়ে ফুটে উঠত, অথবা হত ছবি। অত্যন্ত সন্তর্পণে সেগুলো কাগজের নৌকো করে ভাসিয়ে দিয়েছি কৈশোরের বর্ষার জলে।

ইস্কুলের উঁচু ক্লাসে পৌঁছে একটু সাহস বাড়ল। বাবা চেয়েছিলেন, আমি ডাক্তার হব। আমি মনে-মনে তখন স্থিরপ্রতিজ্ঞ, আর্টস পড়ব, আর কবিতা লিখব। 'দেশ' পত্রিকার ঠিকানায় পাঠিয়ে দিলাম একটা লেখা। 'দেওঘরে কটা দিন'। নিজের বাড়ির ঠিকানা দিইনি, আমি আঁচ করেছিলাম, এ-বাড়িতে বেশিদিন থাকা চলবে না আমার। তাই স্থায়ী ঠিকানা হিসেবে বেছে নিলাম মামাবাড়ির ঠিকানাটা। মাস তিনেক কেটে যাবার পরও যখন লেখাটা বেরুল না, তখন একটু দমে গিয়েছিলাম। কিন্তু মাস ছয়েকের মাথায় একদিন 'আনন্দবাজার' দেখলাম, 'দেশ' পত্রিকার বিজ্ঞাপনে আমার নাম জ্বলজ্বল করছে। সেটা ১৯৫২ সাল।

নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ ঘটল। দু-হাতে শুরু হল লেখা আর লেখা পাঠানো। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার, ছাপাও হতে লাগল এখানে-ওখানে, প্রায় সর্বত্র। ততদিনে কলেজে ঢুকেছি। হাতে-লেখা দেয়ালপত্রিকা চালাই। 'শতভিষা' কাগজে একটা লেখা পাঠালাম, ডাকে। কাগজটা দেখেছিলাম রাঙাদার কল্যাণে। আলোক সরকার ও দীপঙ্কর দাশগুপ্ত ডেকে পাঠালেন। 'দেওঘরে কটা দিন' কবিতাটির প্রশংসা করলেন। বললেন, আমার লেখায় নাকি অমিয় চক্রবর্তীর প্রভাব রয়েছে।

হায়, অমিয় চক্রবর্তী কেন, আধুনিক কবিদের অধিকাংশের লেখাই তখনও পড়িনি, নামও জানি না সকলের। আধুনিক কবি বলতে তখন আমার স্বপ্ন-ধ্যানজ্ঞান দুই দাদা—নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী আর দেবদাস পাঠক। সেদিন 'শতভিষা'র সম্পাদক দু-জন আমার যে কী উপকার করেছেন, তাঁরা নিজেরাও তা জানেন না। রাঙাদার কবিতার বইয়ের তাক উজাড় করে পড়তে শুরু

করলাম আধুনিক কবিতার সমস্ত বই। ফুলদার (হীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, এখন প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক) বন্ধু ও সতীর্থ শঙ্খ ঘোষ। ফুলদারও ব্যক্তিগত সংগ্রহে বহু আধুনিক কাব্যগ্রন্থ। কিছু বাদ রইল না। সিগনেট বুক শপ-এর 'টুকরো কথা' আসত রাঙাদার নামে। সিগনেট-এ খুঁজে পেলাম আমার স্বপ্নলোকের চাবি।

ইতিমধ্যে আরেকটি দারুণ সুদৃশ্য ও শোভন কবিতা পত্রিকার প্রথম সংখ্যা দেখেছি স্টলে। কিনেও নিয়েছি তৎক্ষণাৎ। 'কৃত্তিবাস'। তিনজন সম্পাদক, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, দীপক মজুমদার, আনন্দ বাগচী। কলেজের দেয়াল-পত্রিকার জন্য লেখা চেয়েছিলাম আনন্দ বাগচীর কাছে। কবিতা তো এলই, সেই সঙ্গে এল সাক্ষাৎ আলাপের নিমন্ত্রণ। আনন্দ বাগচীই আমার কাছ থেকে নিয়ে গেলেন একটি সাত লাইনের কবিতা, 'কৃত্তিবাস'-এর জন্য। 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় ছাপা হল সেই কবিতা। সাতটি লাইন সাত রাজার ধন হয়ে এল আমার জীবনে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, দীপক মজুমদার-এর সঙ্গে আলাপ হল। অচিরেই আমি হয়ে উঠলাম 'কৃত্তিবাস' গোষ্ঠীর অন্যতম। সম্পাদক-মণ্ডলীতে জায়গা পেলাম। পরে সহযোগী সম্পাদক হয়েছিলাম। সুনীলের সঙ্গে কিছুকাল, সমরেন্দ্র সেনগুপ্তের সঙ্গেও বেশ কিছুদিন। 'কৃত্তিবাস'-এর সূত্রেই আলাপ হল তরুণতর ও সমসাময়িক সকলের সঙ্গে। নমিতা মুখোপাধ্যায় নামের এক মহিলা কবির লেখা ছাপা হত কাগজে। আমাদের অনেক রোমান্টিক ভাবনা ছিল সমকালীন এই মহিলা কবির সম্পর্কে। সেই নমিতা মুখোপাধ্যায় একদিন হঠাৎ এলেন 'কৃত্তিবাস'-এর

অফিসে, সুনীলের বৃন্দাবন পাল লেনের বাড়িতে। দুপুরবেলা, তুমুল আড্ডার মাঝখানে। কেতাদুরস্ত এক অফিসার। স্যুট, টাই, ব্যাগ! দেখে আমি গড়িয়ে গিয়েছিলাম খাট থেকে মাটিতে। পরে আলাপ হল। ছদ্মনামের আড়াল থেকে আমরা বের করে আনলাম আজকের স্বনামখ্যাত শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়কে। ওঁর প্রথম বই *সোনার হরিণ* বেরিয়েছিল কৃত্তিবাস থেকে। পরেও কয়েকটি। আমি দেখাশোনা করেছিলাম। শরৎ ক্রমশ আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে ওঠেন।

আমার প্রথম বই কৃত্তিবাস প্রকাশনীর নামে বেরোয়। *অতলান্ত*। টাকা পয়সা দিয়েছিলেন এক ভদ্রলোক, ধীরেন্দ্রনাথ রায়। আমার আত্মীয় এবং বন্ধু প্রণব বসু (এখন চলচ্চিত্রের প্রযোজক) যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিল। শঙ্খ ঘোষ বেছে দিয়েছিলেন কবিতাগুলো। বই বেরুনোর জন্যই হোক, বা অল্পবয়স থেকে লেখার জন্যই হোক, ১৯৫৭ সালে রেডিও থেকে কবিতা-পড়ার আমন্ত্রণ পেলাম। তখনো কলেজের গণ্ডি পেরোইনি। কনট্র্যাকট ফর্ম জমা দিতে গিয়ে আলাপ হল প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে। আমাকে দেখে বিশ্বাসই করতে চান না প্রেমেন্দ্র মিত্র যে এত কম বয়েস আমার।

সঞ্জয় ভট্টাচার্যের সঙ্গে আলাপ 'পূর্বাশা'য় লেখার মাধ্যমে। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রাথমিক মনোনয়ন করতেন। 'পূর্বাশা'য় একটা-দুটো লেখা ছাপা হতেই সঞ্জয় ভট্টাচার্যের কাছে যাবার সুযোগ ঘটল। বিষ্ণু দে-র সঙ্গে আলাপ বহু পরে। চিন্মোহন সেহানবিশ-আয়োজিত এক কবি সম্মেলনে জনা তিনেক করে কবিতা পড়তেন এক-একটি আসরে। একবার বিষ্ণু দে-র সঙ্গে

আমার ডাক পড়ল। কবিতা পড়ার পর বিষ্ণুবাবু নিজেই ডেকে আলাপ করলেন। বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা' পত্রিকায় ডাকে লেখা পাঠিয়েছি। ছাপা হয়েছে।

'দেশ' পত্রিকায় সাগরময় ঘোষকে প্রথম দিকে ভয়ে এড়িয়ে চলতাম। জ্যোতিষদাই (দাশগুপ্ত) ছিলেন তখন আমাদের ভরসা। জ্যোতিষদার হাতে টুক করে লেখা দিয়ে পালিয়ে আসতাম। ছাপা হত। 'কৃত্তিবাস' পত্রিকা পৌঁছে দিতে গিয়ে সাগরময় ঘোষের সঙ্গে আলাপ হল। পুজোসংখ্যার জন্য লেখা চেয়ে নিলেন। ছাপার গ্যারান্টি ছিল না। কিন্তু আশ্চর্য, ছাপা হল শেষ পর্যন্ত। ১৯৫৬ সাল থেকেই প্রায় নিয়মিতভাবে শারদীয়া সংখ্যা 'দেশ' ও 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-র লেখক। সাগরময় ঘোষ ইতিমধ্যে সাগরদা হয়ে গেছেন। নিছক সৌজন্যের দাদা নন, সর্ব অর্থেই অগ্রজের স্নেহ উজাড় করে দিয়েছেন। আমার ব্যক্তিগত জীবনেরও বহু ঋণ এই অসামান্য মানুষটির কাছে। 'পত্রান্তরে' একটি প্রবন্ধ পড়ে বিমল কর ডেকে আলাপ করেছিলেন আমার সঙ্গে। 'দেশ' পত্রিকার গ্রন্থ সমালোচনা করতে বলেছিলেন। সেই থেকে তাঁর সঙ্গেও আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। সাহিত্যের গণ্ডি পেরিয়ে পারিবারিক স্তর। রমাপদ চৌধুরীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আরও অনেক পরে। তিনি আমাকে দিয়ে অদ্ভুত দুটো ফিচার লিখিয়েছেন রবিবাসরীয় 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য়। একটি অঙ্কের মজা নিয়ে 'বুদ্ধির্যস্য'। আরেকটি সাহিত্যের ধাঁধার—'পড়ুয়ার পাঠশালা'। মাসিক 'আনন্দমেলা'য় ধাঁধা করার ভারও তিনিই তুলে দিয়েছিলেন আমার কাঁধে, সেই প্রথম সংখ্যা থেকে আজও চলছে। তাঁর কাছেও আমার অপরিশোধ্য ঋণ। এই রকমই ঋণী

আরেকজন সম্পাদকের কাছে। তিনি দৈনিক 'জনসেবক'-এর শান্তিকুমার মিত্র। শান্তিদা আমার পরীক্ষার ফি পর্যন্ত যুগিয়েছেন কলেজ-জীবনে, বহু অকিঞ্চিৎকর লেখা ছেপে টাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

তিন

বাল্যপ্রণয়ে যে অভিশাপ রয়েছে তা আমি লেখা শুরুর আট-দশ বছর বাদেই টের পাই। এর আগে, কলেজ-জীবনে, বহুবার প্রথম পুরস্কার পেয়েছি কবিতা লিখে। কখনো কলেজে, কখনো সারা বাংলা প্রতিযোগিতার। যেখানে লেখা পাঠিয়েছি, প্রায় সব জায়গাতেই ছাপা হয়েছে। পুজো সংখ্যায় ষাট-সত্তরটি পর্যন্ত কবিতা লিখেছি এক-এক মরসুমে। কিন্তু হঠাৎই এক-ধরনের বিপন্নতা বোধ জেগে উঠল আমার মধ্যে। মনে হল, কবিতা শুধু ধ্বনি নয়, ছন্দ নয়, শব্দ নিয়ে খেলা নয়, মিলের চমক নয়, প্রকরণের পরীক্ষা নয়, এ-সব নিয়ে, তবু এ-সব ছাপিয়ে অন্য-কিছু। আমি অনুভব করলাম, আমি নিজেকে খুঁড়িনি সেভাবে। কখনো ভাবিনি, একটি কবিতার মধ্য দিয়ে কোন্ নতুন অভিজ্ঞতার বার্তা পৌঁছে দিতে চাই পাঠকের কাছে। পুরনো লেখাগুলো আমার কাছে হঠাৎই হয়ে গেল বিবর্ণ, বাতিল, লেখা-লেখা খেলা। আমি বিষন্ন, একলা হয়ে গেলাম।

কয়েকটা বছর আমি খুব অস্থিরতার মধ্যে কাটিয়েছি। যা-কিছু লিখি, পছন্দ হয় না, ফেলে দিই। আবার লিখি, আবার ফেলে দিই। এর মধ্যে সমসাময়িক বন্ধুদের কবিতার বই বেরুচ্ছে একের-পর-এক। আমার নিজস্ব বই ছাপার কোনো উদ্যোগ তখন নেই। আমি শামুকের মতো কেবলই গুটিয়ে নিচ্ছি নিজেকে।

ক্রমশ লেখা কমতে লাগল। ছাপার অক্ষরে যার নাম বারবার বেরোয় না, সে ক্রমশ মুছে যেতে বাধ্য পাঠকের মন থেকে। হায়, জনগণের মতো পাঠকের স্মৃতিও বড়ো ক্ষণজীবী। নতুন পাঠকগোষ্ঠীর কাছে আমি ক্রমশ হয়ে উঠলাম ক্যাজুয়াল লেখক।

আমার পারিবারিক জীবনের ক্ষেত্রেও এই সময়ে বহু বিপর্যয় ঘটেছে। সরকারি চাকরির স্বল্প টাকায় সংসারে অনটন। নিজে সংসারী হইনি তখনো, কিন্তু বাবার সংসার আমার কাঁধে। আয়-ব্যয়ের সমতা আনতে আমি উদয়াস্ত রোজগারের নানান পথ বেছে নিয়েছি। টিউশানি, প্রুফ-দেখা, অফিস-লোন—আমাকে গ্রাস করে ফেলেছে। কবিতা লেখায় মন দেবার সময় নেই, মনও হারিয়ে যাচ্ছে। অন্য বহুকিছুর আকর্ষণ আমাকে টানতে লাগল কবিতার থেকে দূরে।

বিয়ের পর কিছুটা ধাতস্থ হলাম। টিউশানি ছাড়লাম, ছাড়লাম বহু খুচরো কাজ। লেখা-সংক্রান্ত কাজকর্ম বাড়িয়েই রোজগার বাড়াবার চেষ্টা করতে থাকলাম। আমার স্ত্রী প্রাক্‌বিবাহ-জীবনে কবিতা কতটা ভালবাসতেন জানি না, কিন্তু আমাকে বোঝবার চেষ্টা করেছেন বরাবর। কবিতা লেখাতেই যে আমার সব থেকে বড়ো তৃপ্তি, সব-কাজের ওপরে যে এই ঐশী ক্ষমতার অনুশীলন, এ-কাজেই যে জীবনের সব-থেকে বড়ো সম্মান, তাঁর এমনতর নানা ধারণার কথা নানাভাবে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন। নিজের চাহিদাকে সঙ্কুচিত রেখে, পার্থিব স্বাচ্ছন্দ্যকে বড়ো করে না-তুলে আমাকে অন্যভাবে অবসর দেবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর চেষ্টা আমি কতটা সার্থক করে তুলতে পারব, এখনো জানি না।

চার

আমার প্রথম বই, *অতলান্ত*, বেরিয়েছিল ১৯৫৫-তে, দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ, *এসো, হাত ধরো*, বেরিয়েছে ১৯৭৭-এর ডিসেম্বরে। মাঝখানে অনেক দিনের শূন্যতা। বস্তুত, 'অনেক দিনের শূন্যতা' নামেই একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের পরিকল্পনা ছিল আমার। পাণ্ডুলিপি তৈরির কাজও শুরু করেছিলাম। হয়ে ওঠেনি শেষ পর্যন্ত। মধ্যবর্তী সময়ের বহু কবিতা হারিয়ে ফেলেছি। *এসো হাত ধরো* তাই আমার নির্বাচিত কবিতার সংকলন, ধারাবাহিকতার কোনো চিহ্ন এতে নেই।

আমি আগেই বলেছি, প্রথম কাব্যগ্রন্থের মানসিকতার অল্পকাল পরেই চিড় ধরে যায়। আমার এখনকার মানসিকতার সঙ্গেও বহু অমিল *এসো, হাত ধরো*-র বহু কবিতার। 'মধ্য তিরিশে' নামের একটি কবিতায় যেমন লিখেছিলাম: "চারিদিকে/ এখন দেয়াল বলতে কিছু নেই, এখন আমায়/ প্রথম সোপান, মানে শূন্যের শরীর থেকে/ গড়ে নিতে হবে/ নিজস্ব নতুন সংস্থান।" সে-কথা আবার মনে হয়েছে, বই বেরুবার পর।

ছন্দে আমি প্রথমাবধি বিশ্বাসী। ছন্দ-ভাঙাতেও। আমি একথা মানি না যে ছন্দ না জেনে ছন্দ ভাঙা যায়। আমার কাছে ছন্দ এখন কোনো পোশাকি ব্যাপার নয়। ভাবনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী-সম্পৃক্ত একটা চেহারা নিয়ে ছন্দ হাজির হয় আমার সামনে। কোনো পূর্ব-সংকল্প থাকে না । গদ্যছন্দে এক স্তবক লেখা, পরবর্তী স্তবক অক্ষরবৃত্তে, এমন একটি কবিতা একবার লিখেছিলাম—কবিতাটির নাম, 'মনে রেখো'। একটি শিশুকে নিয়ে লেখা। সদ্য হাঁটতে শিখছে শিশুটি, টলটলে পায়ে রুপোলি

নূপুর ভুল ছন্দে বাজছে—এই বোধ প্রথম স্তবকে 'ভুল ছন্দ' এনে দিয়েছিল। দ্বিতীয় স্তবকে যেহেতু নিজস্ব অনুভবকে সংবদ্ধ করা, তাই সেখানে ছন্দ ঠিকঠাক। আবার জেনারেশন গ্যাপ নিয়ে লেখা 'উত্তরাধিকার' কবিতায় বলার কথা ছন্দে এল না, তাই ছন্দে ধরিনি, কিন্তু মিল রইল প্রতিটি পঙ্‌ক্তির শেষে। সহজে এল, তাই রেখেছি। 'দূর থেকে' নামেও একটি কবিতা রয়েছে *এসো, হাত ধরো*-র মধ্যে। কবিতাটি জরুরি অবস্থার মধ্যে লেখা। রাজনীতি থেকে দূরে সরে থাকতে চাইলেও যে আঁচ থেকে সরে থাকা যায় না—এমন একটা ভাবনাকে ধরতে গিয়ে দেখি, ছন্দের কাঠামোটা প্রচলিত রীতিতে ধরা পড়ছে না। একটা নৌকো দড়ি দিয়ে বাঁধা, হাওয়ায় অল্প দুলছে নৌকোটা, কিন্তু বাঁধা বলে এগিয়ে যাচ্ছে না—এমন একটা ছবিই যেন ছন্দ হয়ে ফুটছে লেখাটায়। সেই রকমই রেখেছি অবিকল। মিলেরও মজা ছিল প্রতি স্তবকে। একটু তুলে দেখাই—"কে কথা বলছে কার সঙ্গে/ ইশারায় ইঙ্গিতে, ভ্রূভঙ্গে/দূর থেকে দেখেছি এই রঙ্গ/স্রোত মিশে যাচ্ছে কোন্ তরঙ্গে।" 'কে কথা', 'ইশারায়', 'দূর থেকে' বা 'স্রোত মিশে' যে পর্বের আগে আলাদা করে পড়ার, সেটা পাঠক আবিষ্কার করে নিলে ছন্দের মজাটা উপভোগ করবেন এই প্রত্যাশায় আলাদা করে দেখাইনি। অনেক কবিতা পুরোপুরি গদ্যছন্দেও লিখি আজকাল।

আমার প্রাথমিক প্রেরণা নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও দেবদাস পাঠক। এরা দু-জনেই ছন্দে ও প্রকরণে কুশলী। আরম্ভে তাই ছন্দের ওপর স্বাভাবিক প্রবণতা এসে গিয়েছিল আমার। নীরেন্দ্রনাথ আমাকে শুধু যে বাইরে থেকে আচ্ছন্ন করেছিলেন

তা নয়, বহু কবিতায় ভেতর থেকেও প্রভাবিত করেছিলেন একদা। তা ছাড়া, বহু জিনিস শিখেছি তাঁর কাছে। কথা বলে, কবিতা দেখিয়ে, সংশোধনের পরামর্শ নিয়ে। ক্রমশ অভিভূত হই অরুণকুমার সরকারের ধ্বনিময়তায়, নরেশ গুহর সুরে। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কথ্যভঙ্গি আমার কাছে গদ্য-কবিতার আদর্শ। চল্লিশের কবিতা ঠিক আমাদের পূর্ববর্তী বলেই বোধ হয় বেশি করে মনে পড়ে চল্লিশের কাছে ঋণের কথা।

আসলে সব প্রিয় কবির কাছেই থাকে কিছু-না-কিছু ঋণ। সে কবি আগের, পরের, সমসাময়িক—যেমনই হোন না কেন। আবার নিজস্ব নতুন একটি কবিতায় যখন উদ্দীপিত হই, সেই মুহূর্তে অনেক প্রিয় কবিকেই মলিন মনে হয়। কখনো প্রিয় অক্ষরগুলো হয়ে ওঠে প্রতিদ্বন্দ্বী, কখনো মৃত সৈনিক। নতুন কবিতা লেখার সময় আমার মনে হয়, আমার কথা আমি যেভাবে বলতে চাইছি, সেভাবে বলা হয়নি। এই বোধ অবশ্য বেশিক্ষণ থাকে না। লেখার পর নিজের কবিতা সব-থেকে তাড়াতাড়ি অতৃপ্তি এনে দেয়। সেই অতৃপ্তিবোধ থেকেই ফের নতুন কবিতার সৃষ্টির প্রেরণা জেগে ওঠে, ভস্ম থেকে নতুন প্রাণ-পাওয়া পৌরাণিক পাখির মতো।

একটি কবিতা কীভাবে তৈরি হয়ে ওঠে, তার পুরো রহস্য বোধ করি কোনো কবিই জানেন না। একটা অস্পষ্ট আদল থাকে মাথায়, সেটা কখনো বিচ্ছিন্ন পঙ্‌ক্তি হয়ে ফুটে ওঠে কখনো-বা পুরো একটি কবিতাও হয়ে উঠতে পারে। প্রতি মুহূর্তের অভিজ্ঞতা, দৃশ্য, ছবি, ঘটনা, সম্পর্ক, সংলাপ ভেতরে-ভেতরে কাজ করতে থাকে। সেটা কখন, কীভাবে, কী কবিতা হয়ে

বেরুবে আগে থেকে আঁচ করা যায় না আবার শুরু করার পর লেখার গতি অন্য দিকে নিয়ে গেছে রচনাকে, চকিত বিদ্যুতের মতো ঝলসে উঠেছে অভাবিত শব্দ-উপমা-চিত্রকল্প—এমন অভিজ্ঞতাও হয়েছে। কবিতার নির্মাণ-রহস্য আমার বহু কবিতার প্রিয় বিষয়।

কবিতায় দুর্বোধ্যতার ব্যাপারটা আমি খুব ভালো চোখে দেখি না। দুরূহতা এক, দুর্বোধ্যতা আরেক। যাঁরা ভাবেন, কবিতা শুধু কবির নিজস্ব অনুভূতির উন্মোচন, পাঠকের সঙ্গে সংযোগ ঘটানোর কোনো দায়ই নেই কবির, তাঁদের মতে পুরো সায় নেই আমার। কবির নিজস্ব অনুভূতির শিল্পরূপ যদি দরোজা-জানালাহীন এক দুর্গে পরিণত হয়, তা হলে পাঠক উঁকি মারবেন কোন্ পথে? সে-কবিতা তা হলে ছাপতেই বা দেওয়া কেন? কবির নিজস্ব অনুভূতি যেমন থাকবে তেমন থাকবে পাঠককে আমন্ত্রণের একটি খোলা দরোজা। সেই দরোজাটুকু লেখককেই করে দিতে হবে। যে-কোনো কবির কাছে পাঠক হিসেবে এ আমার ন্যূনতম দাবি। আমার নিজের লেখার ক্ষেত্রেও এই বিশ্বাস আমাকে কখনো হঠকারী হতে প্রলুব্ধ করেনি, করেনি এমন কোনো লেখায় প্ররোচিত, যার অর্থ নিজের কাছেও স্পষ্ট নয়। বিচ্ছিন্ন পঙ্‌ক্তিতে নয়, কবিতায় সামগ্রিকভাবে একটি আবেদন থাকা যে জরুরি, অর্থাৎ সব-মিলিয়ে কবিতার মধ্য দিয়ে একটি দৃশ্য, বার্তা কিংবা অভিজ্ঞতাকে যে পৌঁছে দিতে হবে কবিকে এ-কথা আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি। সেই দৃশ্য, সেই বার্তা, সেই অভিজ্ঞতা যে বিশেষ একটি কবির নিজস্ব দৃষ্টিকোণের প্রতিফলন, সে-কথাও যেন বোঝা যায়। মামুলি কথা কবিতার

কথা হতে পারে না। নতুন কবিতাকে হতে হবে যথার্থই নতুন।

আমার কাছে গদ্যের সঙ্গে কবিতার প্রাথমিক তফাত এই যে, আমি মনে করি, কবিতা সব-কথাই বলবে স্মরণযোগ্য করে। 'এই ধরনের কী-একটা কথা যেন ছিল কবিতায়', এ-কথা যেন না বলেন কোনো পাঠক যেন তাঁর স্মৃতিতে ঝলসে ওঠে পুরো পঙ্‌ক্তিটি কিংবা স্তবকটি, অমোঘ শব্দে-শব্দে যা গাঁথা। সেখানেই কবিতার প্রকৃত সার্থকতা।

জানি, এই সার্থকতা অর্জন করা খুব সহজ ব্যাপার নয়। কিন্তু কবি হওয়াও কি সহজ? আমি আমার বিশ্বাসের কথা জানাতে পারি, ইচ্ছের কথা বলতে পারি, প্রত্যাশাকে তুলে ধরতে পারি মাত্র, কিন্তু তার বেশি কিছু বলার যোগ্যতা আমার নেই। আমি জানি, এখনো কিছুই লেখা হয়নি আমার। লেখা শুরু করতে হবে নতুন করে। পারব কি না জানি না।

পাঁচ

কেমন করে হয়ে ওঠে একটি কবিতা?

আগেই বলেছি, এর কোনো নির্দিষ্ট উত্তর নেই, হয় না। এক কবির কাছেও ভিন্ন-ভিন্ন কবিতার সৃষ্টির রহস্য একেবারে আলাদা রকমের হতে পারে।

আমার মনে পড়ছে এমন দু-একটি অভিজ্ঞতার কথা। মেয়েকে যখন হাতে-ধরে প্রথম অ আ ক খ লেখাতে যাই আমার মনে চকিতে ঝলসে উঠেছিল এই ভাবনা যে, যে-বর্ণমালা আজ তুলে দিতে চলেছি মেয়ের হাতে, সেই বর্ণমালার প্রতিটি বর্ণের সঙ্গে একদা মিশে ছিল আমার নিজস্ব বোঝাপড়া, মিশে ছিল আনন্দ এবং দীর্ঘশ্বাস, একান্ত গোপন কিছু অভিজ্ঞতা, অহঙ্কার,

স্মৃতি, অভিমান-পরাজয়, কিছু ব্যর্থতার গ্লানি আর কিছু সফল প্রণয়। কিন্তু মেয়ের হাতে এই বর্ণমালা কী চেহারা নেবে, আমি জানি না। আমি বলতে চাইলাম, 'আমার সমস্ত বর্ণমালা আমি তোমাকে দিলাম, তুমি অন্যভাবে শুরু করো।' এই ভাবেই লেখা হয়েছিল 'বর্ণপরিচয়' কবিতাটি।

কিংবা এই অল্পকাল আগে লেখা 'অলৌকিক' কবিতাটি? বন্ধুবর বিমল রায়চৌধুরীর স্মৃতি সংখ্যায় 'দৈনিক কবিতা' লেখা চেয়েছিল, দিতে পারিনি। এর পরই খবর পেলাম অভিনেতা অরুণ রায় মারা গেছেন। সেই রাত্রেই লেখা হয়েছিল, 'অলৌকিক'। আমি হঠাৎই আবিষ্কার করলাম, যতবারই আমি বিমল-এর কথা ভাবতে চাই, আমার চোখের সামনে একটি বিশেষ দিনের দৃশ্য ভেসে ওঠে। বৌবাজার সেন্ট্রাল এভিনিউর মুখে বিমল দাঁড়িয়ে ছিল, গায়ে রঙিন পাঞ্জাবি, সটান তরুর মতো দেহ, হাসি মেশানো পুরু গোঁফ, স্মিত কৌতুকে ভরা মুখ। বিমল বোধ হয় মেডিকেল কলেজে, কর্মস্থলে যাবে। দোতলা বাস থেকে দেখা এই দৃশ্যটি আমার মনে গেঁথে গিয়েছিল বিমল-এর সান্নিধ্যময় বহু দিনের বহুতর স্মৃতিকে ছাপিয়ে। অরুণ রায়কে শেষ দেখেছিলাম ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে। চলন্ত ট্যাক্সি থামিয়ে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ভরা গলায় অরুণ প্রশ্ন করেছিল, কী খবর? কোথায় যাবেন? তারপর নেমেও এসেছিল। ওর গ্রীকভাস্কর্যের মতো খোদাই করা চেহারা, উড়ো চুল, ভরা গলা, ট্যাক্সি থেকে বাড়ানো মুখ—সব-ছাপানো স্মৃতি হয়ে গেছে। সেই ট্যাক্সিটি নেই, সেই বাসটি নেই, তবু স্মৃতির ভিতরে রয়ে গেছে চিরদিনের এক জ্বলন্ত ছবি। 'বিমল দাঁড়িয়ে আছে, অরুণ বাড়িয়ে আছে মুখ' এই

নিয়েই সেই রাত্রে লিখেছিলাম 'অলৌকিক' কবিতাটি। একজন মানুষ একটি বিশেষ দিনের বিশেষ মুহূর্তের স্মৃতি হয়ে কীভাবে চিরকাল বেঁচে থাকে সেটা সেদিনই উপলব্ধি করেছিলাম।।

এমন বহু স্মৃতি বহু কবিতার অনুষঙ্গে জড়ানো।

ছয়

প্রতিটি মানুষ যদি দুটি করে জীবন পেত, আক্ষেপ শব্দটিই অভিধান থেকে বোধ করি হত বর্জিত।

আমার এই জীবন শুধুই আক্ষেপের। গান গাইতে পারতাম, গায়ক হইনি। ম্যাজিক শিখেছি, কাউকে সেভাবে দেখাইনি। ছবি এঁকেছি, ধাঁধা নিয়ে পড়ে থেকেছি, অঙ্কের মজায় ডুবে থেকেছি, গো-গ্রাসে পড়েছি হাতের কাছের বই, কিন্তু কিছুই হয়ে উঠিনি।

সাগরদা আমার সংগীত-নাটক সমালোচক করে দিয়েছেন, রমাপদ চৌধুরী করেছেন ফিচার-রাইটার, বিমল কর দায়িত্ব দিয়েছেন গ্রন্থ-সমালোচনার, বাদল বসু ডেকে নিয়েছেন বিজ্ঞাপন-লেখক হিসেবে—সংসারে ধার কমেছে, শৃঙ্খলা এসেছে এই মাত্র।

কিন্তু যে-কাজ করার দায়িত্ব আমি স্বেচ্ছায় বরণ করেছিলাম, যে-কাজ সম্পূর্ণভাবেই আমার একলার, যে-কাজ করে উঠতে পারলে জীবনের অস্তিত্ব হয়ে উঠত অর্থময়, সে-কাজ আমার কোনোকালেই মন দিয়ে করা হয়নি। কিছুকাল আগে 'দেশ' পত্রিকাতেই লিখেছিলাম একটি কবিতা। নাম—'চাবুক'। এইরকম আরম্ভ ছিল তার—"পুরনো কবিতা চোখ ঠার দিয়ে ডেকে যায়, বলে—/ভালো আছো? / শাদা পাতাগুলি অবিকল শাদা থেকে যায়, বলে—/ভালো আছো? / রক্তে কে যেন হু-হু

শূন্যতা এঁকে যায়, বলে—/ ভালো আছো ? / ঘুমন্ত মুখে আলো ফেলে এসে দেখে যায়, বলে—/ ভালো আছো?" মানসিক যে-অবস্থার কথা বলতে চেয়েছিলাম এই কবিতায়, তা বিশেষ কোনো মুহূর্তের নয়, সর্বক্ষণের, সর্বসময়ের। আরও কতকাল শাদা পাতাগুলি থেকে যাবে অবিকল শাদা? আরও কতকাল প্রিয় কবিতা, পুরনো কবিতা হিংস্র কশাঘাতে আমাকে করবে জর্জর? আমি জানি না।

আমি সত্যিই জানি না, 'ভালো আছো?' এই প্রশ্নের সদর্থক উত্তর এই জীবনে কাউকেই কোনোদিন দিয়ে উঠতে পারব কি না।

কবিতা, আমার প্রথম ও শেষ প্রেমিকা। আমার তৃষ্ণা, বাসনা, নিশ্বাস। আমার নিয়তি। তুমি কি জানো?

দেশ, সাহিত্যসংখ্যা, ১৩৮৭ (১৯৮০)-তে প্রকাশিত

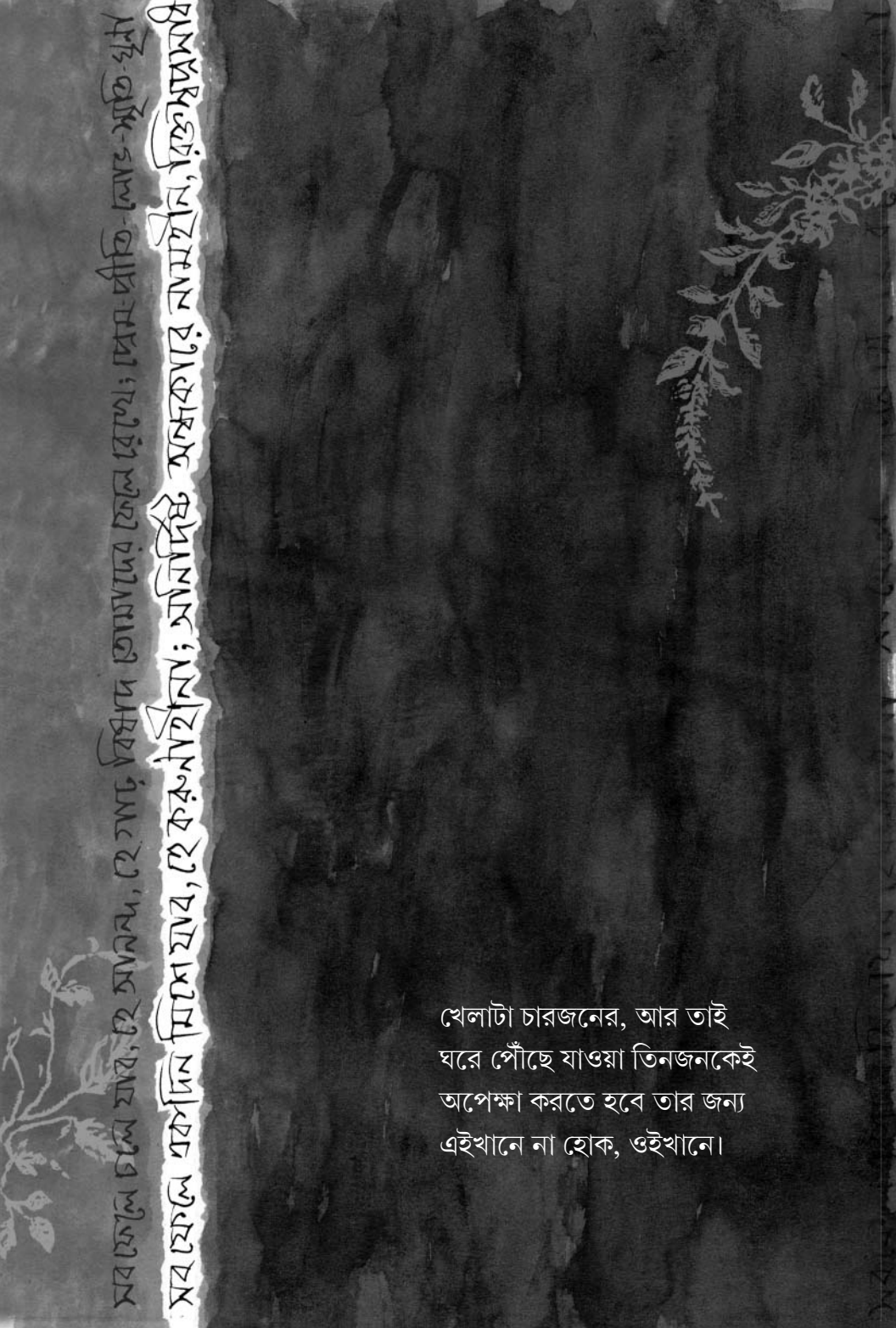

খেলাটা চারজনের, আর তাই
ঘরে পৌঁছে যাওয়া তিনজনকেই
অপেক্ষা করতে হবে তার জন্য
এইখানে না হোক, ওইখানে।

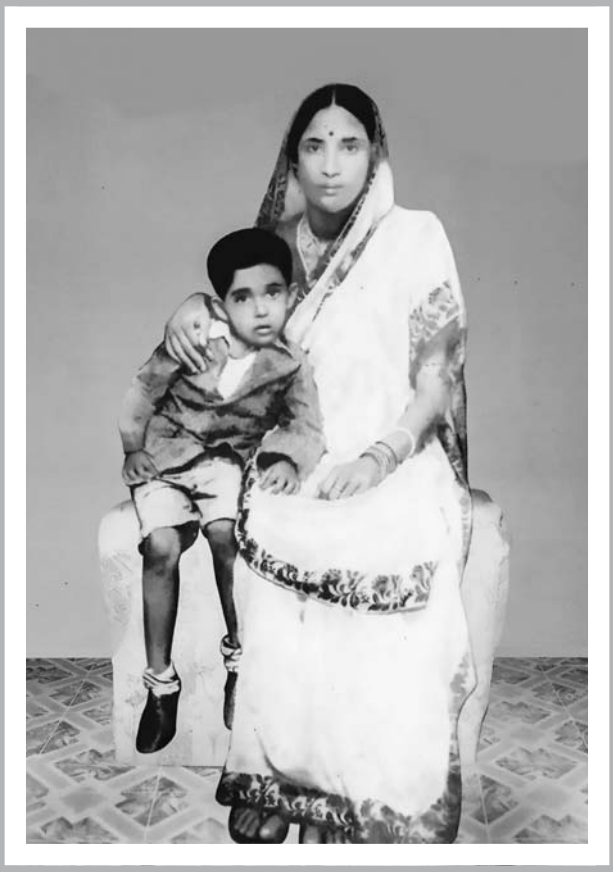

মায়ের সঙ্গে শিশু প্রণবকুমার

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায় ও অন্য কয়েকজন

হীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

প্রণব চলে গেল, রেখে গেল ছেলেবেলার কিছু স্মৃতি।

প্রণব ছিল আমার পিসতুতো ভাই, ছোটোপিসির ছেলে; আমি তার ফুলদা, তার চেয়ে সাত বছরের বড়ো। দীর্ঘ আয়ু মন্দ নয়। যদি সুস্থ থাকা যায় অনেক নতুন অভিজ্ঞতার সঞ্চয় বাড়ে, কিন্তু কনিষ্ঠের মৃত্যু একটা শাস্তি। সেই শাস্তি আমাকে পেতে হল।

প্রণবের প্রথম কবিতাগুচ্ছ *অতলান্ত* তার মা-কে উৎসর্গিত। এর একটা ইতিহাস আছে। আমার এই ছোটোপিসি সার্থকনামা:

নিরুপমা। নিরুপমা ছিলেন ডাকসাইটে সুন্দরী। কিন্তু যা হয়, রূপ তাঁকে সুখ দেয়নি। বিবাহের পূর্বে ও পরে তাঁর অনেক ভক্ত জুটেছিল, এইটুকুই যা। এসব গল্প শুনেছি আমার মায়ের মুখে। নিরুপমা, মা ডাকতেন পুঁটি, আমার মায়ের প্রথম সন্তানের সমবয়সি, আমার সেই না-দেখা দিদি জন্মের পর বেশি দিন বাঁচেননি, ছোটোপিসি তাই আমার মায়ের কোলেই বড়ো হয়েছিলেন। সেকালে এমন ঘটত।

দাদা নীরেন্দ্রনাথের কাছে শুনেছি ছোটোপিসি বালিকা বয়েসে একটু ডানপিটেও ছিলেন, Tomboyish আর কী। পাঁচ বছরের বড়ো এই পিসির ছোঁড়া লাট্টুর ক্ষতচিহ্ন দাদার কপালে অনেকদিন স্থায়ী হয়েছিল।

পিসিকে নিয়ে আমার প্রথম স্মৃতি কলকাতায়, আমাদের চাঁপাতলায় ২৪বি নূর মহম্মদ লেনের বাড়িতে। আনুষ্ঠানিক হাতেখড়ির আগেই এই পিসির কাছেই আমার বর্ণপরিচয়। পিচবোর্ডের উপর অ-আ-ক-খ লিখে পিসি টাঙিয়ে দিয়েছিলেন দোতলার ঘরগুলিতে, যেতে-আসতে সেই বর্ণমালা আমার একদিনেই শেখা হয়ে গিয়েছিল। তখন আমার বয়স চার, পিসির পনেরো।

এর কিছু পরেই পিসির বিয়ে হয়ে গেল। সম্পন্ন কুলীন জামাই পেয়ে ঠাকুরদা লোকনাথ বোধহয় জাতে ওঠার ধান্দায় ছিলেন, কিন্তু বিয়েটা সুখের হয়নি। আমার এই পসারওয়ালা ডাক্তার পিসেমশাই গোলগাল চেহারার একটু মোটা-দাগের আমুদে মানুষ ছিলেন। আমার শান্তশিষ্ট ভীতু স্বভাবের জন্য আমাকে ডাকতেন 'গদাধর'-নামে।

প্রণব যখন হাসত তখন ওর বাপের চেহারার সঙ্গে মিল ধরা পড়ত। অন্য কিছুতে মিল ছিল না পিতাপুত্রে। প্রণবের টানা-টানা চোখে ছিল স্বপ্ন, তার খবর রাখতেন না তিনি।

সদ্যজাত প্রণবকে নিয়ে ভবানীপুরের সেবাসদন থেকে পিসি এসে উঠেছিলেন গলির ধারে আমাদের দোতলার ছোটো ঘরটিতে। স্ত্রী ও সন্তানের জন্য পিসেমশাই নিয়ে আসতেন গ্ল্যাক্সোর টিন, বিলিতি বিস্কিটের বাক্স, আর নানা ফলের ঝুড়ি। (পিসির প্রশ্রয়ে রকমারি বিস্কিটে ভাগ বসাতাম আমি।) কিন্তু ওই পর্যন্তই : বিস্কিট পেলেও পিতৃস্নেহ পায়নি প্রণব। অনতিকাল পরেই ডাক্তার বাপ আসক্ত হলেন কোনো সহকর্মিণীর প্রতি, তিনি ঘরে এলেন পিসির সতীন হয়ে।

ওই সময়ে, তিরশের দশকের শেষাশেষি কিংবা চল্লিশের গোড়ায়, ছোটোকাকার সঙ্গে মাঝেমাঝেই যেতাম পিসিকে দেখতে, চিত্তরঞ্জন হাসপাতালের পিছনে ওদের ডিহি শ্রীরামপুরের বাড়িতে। তখনও সিআইটি রোড তৈরি হয়নি, মৌলালি থেকে বাঁয়ে ঘুরে, দু-ধারে ঝোপঝাড় পেরিয়ে দশ নম্বর বাস চলত বালিগঞ্জ-মুখো।

ডিহি শ্রীরামপুরে কিশোর প্রণবের মন টিকত না। কখনও মায়ের সঙ্গে, কখনও একা-একা চলে আসত চাঁপাতলার মামাবাড়িতে। ওর কবিজীবনের জন্ম সেইখানে। আমার বাবার মৃত্যুর (ডিসেম্বর ১৯৪৭) পরে আশ্রিতের সংখ্যা কমে গিয়ে আমাদের সংসারে মানুষজন তখন হাতে-গোনা। তারও বছর চারেক পরে দাদা-বউদিরা আর ছোটো কাকা-কাকিমারা অন্যত্র চলে যাবার পর বাড়িতে ছিলাম শুধু মা, আমি, আমার ছোটো

বোন মিন্টু (প্রতিমা, প্রণবের সুন্দরদি), আর দাদার জায়গা পূর্ণ করে দিয়ে আমার রাঙাদা দেবদাস পাঠক, আমার মেজোপিসির ছোটোছেলে। মামাবাড়িতে প্রণব যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচত। সেখানে দাদা-রাঙদা কবিতা লেখায়, আর আমি কলেজবন্ধু শঙ্খকে নিয়ে কবিতা পড়ায় মত্ত; ওদিকে প্রতিমা গান শিখছে গীতবিতান-এ; সুন্দরদির শিখে-আসা গানের সুরে সুর মেলাচ্ছে প্রণব। বয়সে আমার আর প্রণবের মাঝখানে ছিল প্রতিমা, বুক দিয়ে ভালোবাসত আমাদের দুজনকে।

বিএ পাশ করে সরকারি চাকরি পেয়ে গেল প্রণব: চাকরির চেয়ে বড়ো কথা পেল স্বাধীনতা। বাপের অধীনতা থেকে মা-কে মুক্ত করল সে। বাসা বাঁধল চাঁপাতলার কাছেই মির্জাপুরে কানাই ধর লেনে। চাকরির টাকায় কুলোত না; যদিও সে কালে-কালে অর্থ দপ্তরের উপ-সচিবের পদ অলংকৃত করেছিল, কিন্তু তার আগে অনেক আজেবাজে কাজে, যেমন গৃহশিক্ষকতায়, সময় নষ্ট হয়েছে ওর। টুকটুাক অন্য কাজও করেছে অবশ্য, যেমন 'দেশ' পত্রিকায় সংগীত-সমালোচনা, কিংবা আনন্দ পাবলিশার্সের জন্য মনোহর গদ্যে বইয়ের বিজ্ঞাপন-রচনা।

তবে গদ্য ওর প্রাণের ভাষা ছিল না; প্রণব ছিল আগাপাশতলা কবি। তাসের ম্যাজিক রপ্ত করেছিল যেমন, কবিতার ম্যাজিকেও সে ছিল ওস্তাদ। ওর 'লুডো' কবিতায় তার মন-কেমন-করা ইঙ্গিত রয়ে গেছে। কবিতাটির জন্মকথা আমার জানা: ছেলেবেলায় ছুটির দিনে প্রণবের মতোই এসে জুটত আমার খুড়তুতো ভাই ঝন্টু (শ্যামল, পরে 'আনন্দবাজার'-এ সাংবাদিক), আর আমার বাবার স্কুলবন্ধু বীরেশ্বর কাকার ছেলে খোকন (সমীর, পরে সে

বিলেতে গিয়ে অ্যাকাউটেন্সি চর্চা করেছে)। দোতলার মধ্যের ঘরে বসত আমাদআর লুডো খেলার আড্ডা: হলুদ ঘুঁটি নিত শ্যামল, লাল ঘুঁটি প্রতিমার, সবুজ আমার বা সমীরের, আর নীল প্রণবের। প্রণব

হেরে গিয়ে ভ্যাবাচাকা। তবে এখনও ছাড়েনি তার হাল।
কেননা নীল জানে
যে যতই ঘরে পৌঁছক,
মাত করুক চাল,
খেলাটা শেষ নয় এইখানে।
জানে,
খেলাটা চারজনের, আর তাই
ঘরে পৌঁছে যাওয়া তিনজনকেই
অপেক্ষা করতে হবে তার জন্য
এইখানে না হোক, ওইখানে।

এমন আটপৌরে শব্দের মধ্যে কৌতুক আর তারুণ্য মিশিয়ে দিতে পারত জাদুকর প্রণব। যে-বইয়ের অন্তর্গত এই কবিতা সেটি *জল, তবু দগ্ধ-করা* (প্রকাশ ২০০৫), উৎসর্গ ওর সুন্দরদি ও শ্যামলকে। জানি না, তাদের সঙ্গে ইতিমধ্যে প্রণবের দেখা হয়েছে কিনা।

ওই একই কবিতাগ্রন্থে 'অলৌকিক' নামে আরেকটি কবিতায় মৃত দুই বন্ধুকে নিয়ে রহস্যময় পংক্তি:

শেষ ট্রাম ফিরে গেছে, ট্যাক্সির মিটারে লাল শালু
স্মৃতির ভিতরে তবু অলৌকিক এক ট্রামস্টপ
মেঘলা দুপুরবেলা অচেনা ট্যাক্সির থেমে-থাকা
বিমল দাঁড়িয়ে আছে, অরুণ বাড়িয়ে আছে মুখ।

মৃত্যুর মতোই অনুভূতিশীল মানুষের ভাবনা কাঁপিয়ে দেয় ভালোবাসা। আমাকে নিয়ে যেমন প্রণবের নির্বোধ গর্বের অন্ত ছিল না (বলেন কেন, জোর করে লিখিয়েছে সৈকত মুখোপাধ্যায় আর সমরেন্দ্র সেনগুপ্তের পত্রিকা দুটোর জন্য), তেমনই ওর ভবিষ্যতের গৌরীবউদিকে ঘিরে ছিল মুগ্ধ বিস্ময়। বছর দুই আগে মোবাইলে ঝাড়া আধঘণ্টা বকে গেল প্রণব, বিষয় ওর কৈশোরের গৌরীবউদি: কবে কখন তিনি প্রণব আর প্রতিমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন নিউ মার্কেটে, কী সব খাইয়েছিলেন দামি রেস্তোরাঁয়, আর কেমন ঝলমলে রূপসী ছিলেন তিনি। গৌরী যখন ওর বউদি হয়ে এল, দুধে-আলতায় পা রাখার আগে খুলে-রাখা চটিটা সরিয়ে ফেলেছিল ম্যাজিশিয়ান প্রণব। সেই চটি ফেরত-পাওয়া নিয়ে কত কাণ্ড! আর এ নিয়ে পরে কত হাসাহাসি করতে দেখেছি ওদের দুজনকে।

মেয়েরা দেখেছি কেনাকাটার ব্যাপারে প্রণবের সূক্ষ্ম রুচির উপরে ছিল নির্ভরশীল। কোথায় কোন্ দোকানে মিলবে ঘর-সাজানোর টুকিটাকি, কোথায় লুকিয়ে আছে শাড়ি আর গয়নার সাম্প্রতিকতম কারুকৌশল—এসব জানত বটে প্রণব। এই জ্ঞানভাণ্ডার ওর কাজে লেগেছিল শ্রাবণীকে বিয়ে করার পরে। ছিমছাম ছিল ওদের গৃহস্থালি, সেটা আরও পূর্ণতা পেল টুপুরের জন্মের পর। চমৎকার রান্না করত শ্রাবণী, মেনু বানাত প্রণব। যোধপুর পার্কে ওদের ফ্ল্যাটে গৌরীকে নিয়ে কয়েকটা সন্ধ্যা কাটিয়ে ছিলাম মনোরম, কবিতায়-গানে-গল্পে-সুস্বাদু খাদ্য পানীয়ে।

জীবনের শেষ ত্রিশ বছর কিন্তু প্রণব ছিল সংসারে এক সন্ন্যাসী। ওর কাছে গল্প শুনেছি মনুমেন্টের কাছে নির্জন এক

সন্ধ্যায় ওকে ভুলিয়ে হাতসাফাইওয়ালারা ওর শখের শেফার্স কলমটি হাতিয়েছিল। সেটি উদ্ধার হয় ওর কবিবন্ধু তারাপদ রায়ের আত্মীয় স্বনামধন্য দেবী রায়মশাইয়ের সৌজন্যে। কিন্তু কোথাও কি এমন পুলিশকর্তা আছেন যিনি শ্রাবণী আর টুপুরকে ফিরিয়ে আনতে পারতেন প্রণবের কাছে? কোনো দেবী রায়ই কি পারতেন সেই অসাধ্যসাধন করতে?

কিন্তু আশ্চর্যের কথা, প্রণব নিঃশব্দে মেনে নিয়েছিল এই ক্ষতি। সে তো ছিল আর সব কিছুতেই আমাদেরই মতো, এমনকি ঘন-ঘন অভিমানে ওর ছেলেমানুষি ধরা পড়ত। কিন্তু সেই প্রণবকেই তো দেখলাম পারিবারিক শোকে কোনো নালিশ নেই, নেই হাহাকার। ও মনে করত শ্রাবণী আর টুপুর ওর কাছে এসেছিল রেলগাড়ির সহযাত্রী যেমন আসেন, অনেক আলাপ-পরিচয়ের পর নিজের গন্তব্যে নেমে পড়ে আর ফেলে-আসা কামরার দিকে ফিরেও তাকান না, স্ত্রী-কন্যাও তেমনই নেমে গিয়েছিল নিজ-নিজ স্টেশনে। এ নিয়ে হাহাকার নিরর্থক।

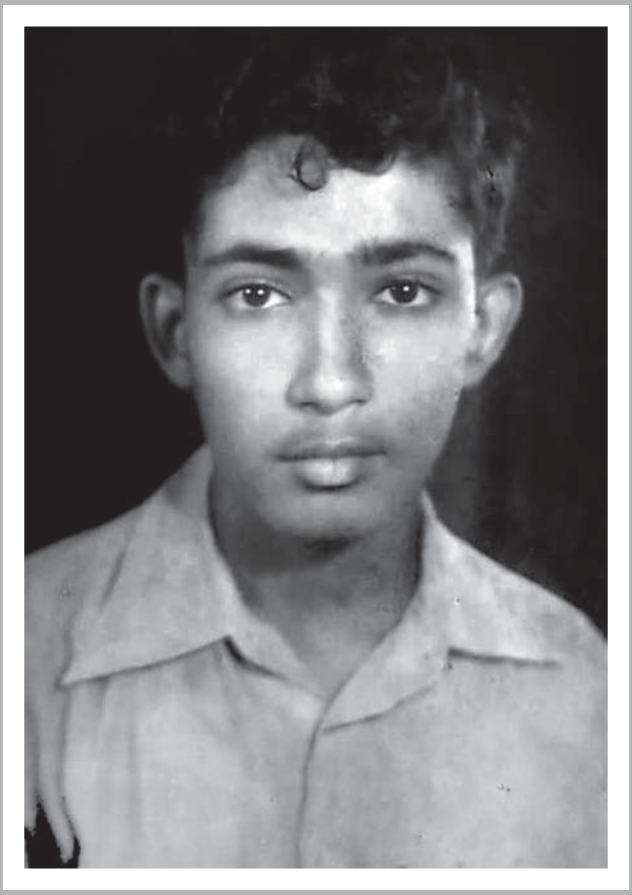

বয়ঃসন্ধিকালে কবি প্রণবকুমার

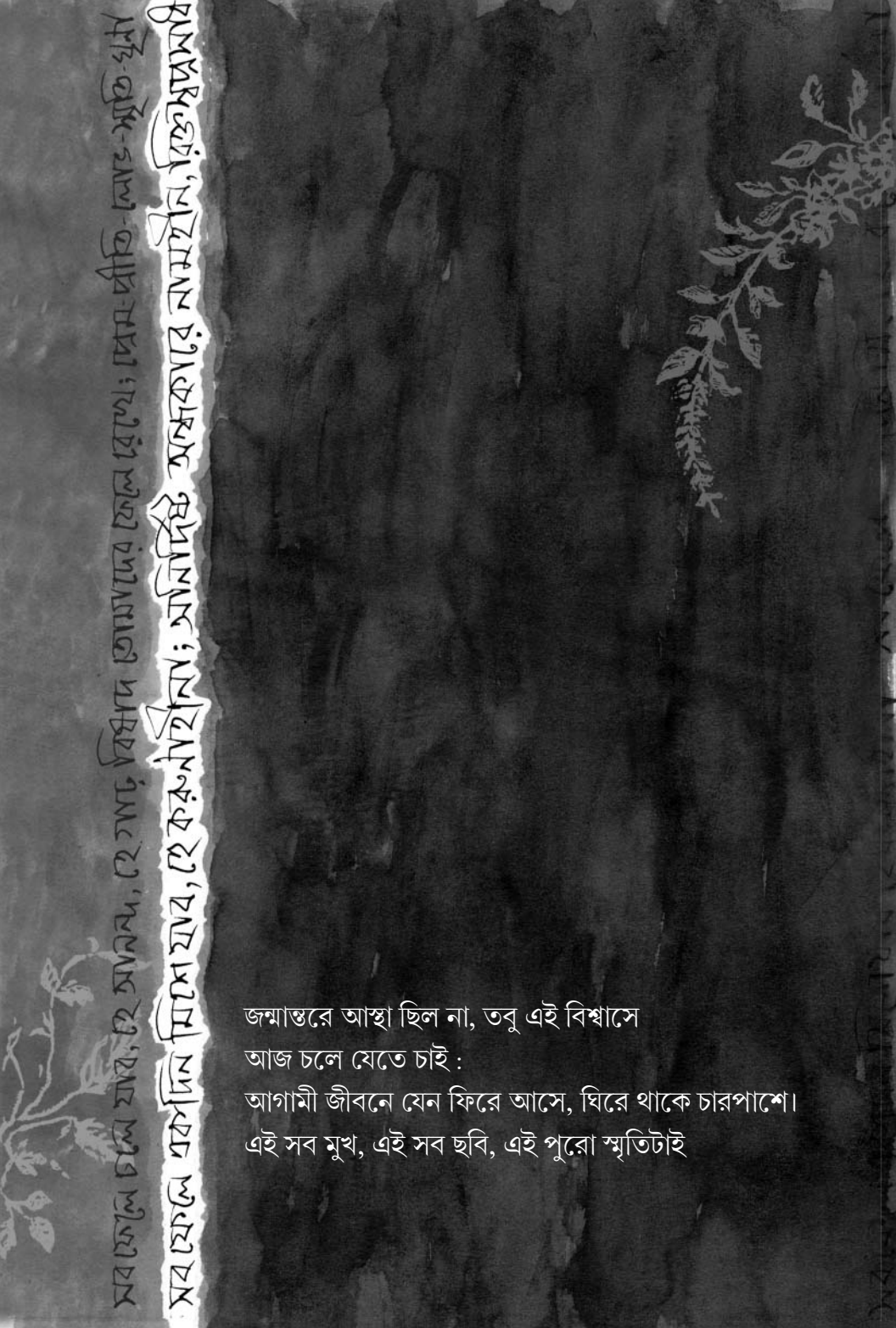

জন্মান্তরে আস্থা ছিল না, তবু এই বিশ্বাসে
আজ চলে যেতে চাই :
আগামী জীবনে যেন ফিরে আসে, ঘিরে থাকে চারপাশে।
এই সব মুখ, এই সব ছবি, এই পুরো স্মৃতিটাই

যৌবনে সুনীল-শক্তিসহ সবান্ধব প্রণবকুমার

রবীন্দ্রসংগীতের মতোই প্রণবকুমারের জীবন, তানালাপ বর্জিত ও সুঠাম

সুধীর চক্রবর্তী

বেঁচেবর্তে থাকতে চাই অফুরান বেগে
মৃত্যুকে সযত্নে ঢেকে রাখি—
চারদিকে পরিকীর্ণ জীবনের মাঝে
মৃত্যুশোক একান্ত একাকী।

'দেশ' পত্রিকায় একবার কবি অরুণকুমার সরকারের কাব্যসমগ্র বিষয়ে গ্রন্থ সমালোচনা লিখেছিলাম। অরুণকুমার আমার অন্যতম প্রিয় কবি কিন্তু কেমন যেন প্রাপ্য প্রতিষ্ঠা বা অনুজ

কবিদের ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত বলে আমার বরাবর মনে হয়, লেখার মধ্যে আমি তাই তাঁর কবিতার নম্রনিজস্ব উচ্চারণ বিষয়ে জোর দিয়ে মন্তব্য করেছিলাম। তখন তিনি অবশ প্রয়াত। 'আমার ছেলেকে' শিরোনামে তাঁর কবিতার একটি অংশ আমার কণ্ঠস্থ। তাতে বলা আছে :

তুমি ফল পাবে বলে
এই বৃক্ষ রোপণ করেছি।
রোজ একটু জল দিও গাছে
জল দিও।

তার রোপিত কবিতাবৃক্ষে আমরা অবশ্য অভিপ্রেত সেচন করিনি কিন্তু জানি এ নিয়ে তাঁর কোনো শোচনা হত না। 'দেশ'-এর লেখাটি পড়ে কবিতাপ্রেমী ও অরুণকুমার সরকারের বন্ধু অলোক মিত্র একটি ইনল্যান্ড লেটারে আমাকে ব্যক্তিগত পত্রক্ষেপ করে জানিয়েছিলেন লেখাটি তার ভালো লেগেছে এবং সেইসঙ্গে আলাদাভাবে মন্তব্য করেছিলেন, "অরুণের কবিতা খুব ভালো, আর সে মানুষ হিসাবেও ছিল অত্যন্ত ভালো।"

কথাটা আমার মনে ধরেছিল। কবিতা ভালো লেখেন এবং মানুষটিও ভালো—কথাটা নিয়ে তর্ক উঠতে পারে যদিও। সে তর্ক এখন স্থগিত রেখে বরং বলতে পারি আমার চেনাজানা দুজন কবির নাম মনে ভেসে ওঠে, তার একজন আনন্দ বাগচী আরেকজন প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়। দুজনকেই ঘনিষ্ঠভাবে জানি বলা যাবে না, কিন্তু সনিষ্ঠভাবে পড়ে চলেছি সেই পঞ্চাশের দশক থেকে। আনন্দ তো কলেজজীবনেই চমকে দিয়েছিল তার *স্বগত সন্ধ্যা* কাব্য প্রকাশ করে। সে হল ১৯৫২-৫৩ সাল, তখন

আমি কৃষ্ণনগর কলেজে থার্ড ইয়ার। এক চুমুকে *স্বগত সন্ধ্যা* শেষ করে ফেলেছিলাম মনে পড়ে। আনন্দ-র সঙ্গে আলাপ হল পরে, এম.এ পড়তে এসে। আমি এক ক্লাস উচুতে, সে সমবয়সী কিন্তু এক ক্লাস নীচে। তাতে অবশ্য বন্ধুত্বে বাধেনি। নম্র শান্ত ভদ্র কিন্তু প্রচ্ছন্ন রসিক। বাঁকুড়ায় অধ্যাপনা দিয়ে জীবিকার শুরু, তারপরে 'দেশ' পত্রিকা। সেখানেই তার সঙ্গে যাবতীয় কথাবার্তা। পারিবারিক জীবনে খুচরো বিপর্যয় ঘটে গিয়েছিল কিন্তু কোনোদিন বলেনি। সৌজন্য ও স্বল্পবাচনের স্বভাব যাদের তাদের ভাগ্যহত হওয়া অনিবার্য, তাই আনন্দ আজ স্বনির্বাসী। আনন্দ-র পিঠোপিঠি আসে প্রণবের কথা। বয়সে আমার সামান্য অনুজ কিন্তু বহুদিনের আলাপ। মিষ্টভাষী ও শিষ্টভাষী। ছন্দকুশল, শব্দচেতন, অনুভূতিময় কবি। কতদিন লিখছেন, অথচ ক্লান্তির ছাপ নেই। গান ভালোবাসা মানুষ—ভালোমানুষ। আশ্চর্য যে ভাগ্য তাঁকেও দংশেছে। স্ত্রী আর একমাত্র কন্যা বীতজীবন। কলকাতায় একা এবং একক, সঙ্গী কবিতা আর গান।

এভাবে কোনো কবির কবিতাকে বোঝার পূর্বশর্ত হতে পারে না। জানি তবু অপ্রতিরোধ্যভাবে কথাগুলি এসে গেল কলমের ডগায়! কবি বলতে একসময় বোঝাত বাবরি চুল, উদাস দৃষ্টি, ন্যাকান্যাকা কথা, মেয়েলি কণ্ঠ, আলুলায়িত ধুতি—এখন সেসব কল্পচিত্র ভেঙে গেছে সঙ্গত কারণে। পাশপাশি গত কয়েক দশকে আমরাই দেখেছি কবি বলতে বেশ ক'জন অবিন্যস্ত চুল উকুনভর্তি, লম্বা নখ ময়লা ভরা, দাঁত না মাজা, নোংরা জামা প্যান্ট, রাত জাগা কর্কশভাষী, নেশাতুরকেও। সুখের বিষয় এঁরা

নিতান্ত আঙুলে গোনা। আমাদের জানা কবিদের মধ্যে রগচটা, তির্যকভাষী বা ঘোর রাজনীতি করাও কজনকে দেখেছি বইকি। আবার কবিতায় আমগ্ন, আত্মউদাসীন বিনয় মজুমদারকে যেমন দেখেছি তেমনই দেখেছি আনপ্রেডিক্‌টেব্‌ল্‌ শক্তিকে। যে আবেগকে রুখতে জানত না, প্রকাশ্য আচরণে বিতর্কিত ছিল, কিন্তু আদ্যন্ত প্রেমীস্বভাবের, চঞ্চল কিন্তু আশ্চর্যরকম আত্মস্থ। আনন্দ বা প্রণবকে এদের কারোর সঙ্গে মেলানো যাবে না। সর্বদা সুভদ্র, বন্ধুবৎসল, রুচিমান ও শান্তস্বভাবের। কবিতার খোঁজে প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়ের রচনা আমি বেছে নিয়েছি এইজন্য যে, তার মতো আত্মপ্রচারকুণ্ঠ অথচ অন্যকে প্রশংসা করবার আগবাড়ানো প্রবণতা আর কারোর মধ্যে দেখিনি। যাকে বলে ডাকাবুকো যৌবন বা বর্ণরঙিন জীবন, বেপরোয়া চলাফেরা বা উচ্চভাষণ তা প্রণবের স্বভাবের সঙ্গে বা তাঁর কবিতার স্বরের সঙ্গে মেলে না। তাঁর প্রিয় রবীন্দ্রসংগীতের মতোই যেন তাঁর জীবন—তানালাপ বর্জিত কিন্তু সুঠাম। কথা ও সুরের হরগৌরী মিলনে প্রণবের জীবন আর কবিতা একইরকম যৌগপদ্যে ভরা, সুষমাময় ও অনুচ্চকিত কিন্তু গভীর পর্যবেক্ষণে ছিল স্বতন্ত্র যাতে পরে লাগবে ব্যক্তিবেদনার আভা। হাতের লেখাটি সুন্দরভাবে গ্রথিত এবং পাণ্ডুলিপিতে কখনই বর্ণাশুদ্ধি যেমন থাকবে না তেমনই অসম্ভব ছন্দশৈথিল্য আবিষ্কার করা। এত চমৎকারভাবে প্রস্তুত হয়ে-আসা কবি বড়ো একটা এখন দেখি না। নানা বিষয়ে তার রুচি ও দক্ষতা। ভালোভাবে রবীন্দ্রসংগীত শিখেছেন এবং আত্মস্থ করেছেন তার বাণী। সরকারি আমলার চাকরি নির্বাহ করেছেন সুচারুভাবে, বিজ্ঞাপন ও ব্লার্বের বয়ান লিখতে পারেন,

হতে পারেন ‘মজার খেলা’ বা ‘ধাঁধা’-র চটজলদি প্রণেতা, সংগীত সমালোচনায় দড় আবার জাদুবিদ্যা বিষয়ে উৎসাহী। কিন্তু তাঁর মূল জাদু প্রচ্ছন্ন রয়েছে তাঁর জীবনস্পৃহ অবলোকনে আর কবিতার বাচনে। দুটি নমুনা দেখাব। প্রথমে:

ডাকবাক্সে ধুলো জমে, পুরু সর গাছের কোটরে,
বনমল্লিকার সাজে কবে ফের নব পত্রালিকা,
ভরে উঠবে ডাকঘর অপার্থিব অমল সুধায়!

পড়তে পড়তে ভাবি, রবীন্দ্রনাথ কতখানি আগত হলে তবে এমন স্বতঃউৎসার জেগে ওঠে! এর পাশে পড়ব :

এক ফোঁটা দু’ফোঁটা করে করে পড়ছে জল,
পথ-ঘাট জোড়া
উঁচু-নিচ গর্ত ও খোঁদল
গুজরাটি কাজের মতো টুকরো টুকরো আয়না দিয়ে মোড়া।

এক মোক্ষম উপমায় গাঁথা বৃষ্টিজলের আলোর প্রতিবিম্বন। জাত কবির কলম।

প্রণবকুমারের অন্যসব কাব্যগ্রন্থ এড়িয়ে এবং পেরিয়ে হাতে তুলে নিচ্ছি অন্যরে কটি কবিতা, যা তাঁর ব্যক্তিজীবনকে বিদীর্ণ করে উঠে এসেছে অথচ তাতে মিশে আছে শান্ত ও শমিত এক নিঃসঙ্গতার কান্তি। কাব্যটির নাম ‘জল, তবু দগ্ধ করা’। কবিতাগুলির পরতে পরতে মৃত্যুর প্রচ্ছন্ন অবয়ব খুঁজে পাওয়া যাবে যদি পাঠক হন অনুকম্পায়ী। মৃত্যু, মৃতদেহ, শ্মশান, দাহকাজ, আগুন ও তার লেলিহান মহিমা এবং সবশেষে বারিধারা, জল। জল বলতে শুধু মর্ত্যজল নয়, যার অন্যতম কাজ চিতার নির্বাণ। কবি জানেন,

কিছুটা আগুন নেবে সময়ের জলে,
কিছু তবু ধিকিধিকি
জ্বলে অলক্ষে প্রতি পলে-অনুপলে
বুকের ভিতরে ঠিকই।

এই হল ব্যক্তির নিজস্ব জতুগৃহের যাপন, যার কোনো নির্বাণগত শান্তিকল্যাণ নেই, যে-আগুন দৃশ্যবহ নয়, কাউকে দেবারও নয়— শুধু স্মৃতিজীবী। 'হঠাৎ হাওয়া' কবিতাটি পুরোটাই পড়ে নিতে হবে এই স্মৃতির অন্তর্ঘাত বুঝে নিতে। কবির নিজস্ব দর্শন তাঁকে বোঝায়:

মানুষ থাকে না, শুধু
পড়ে থাকে দিনানুদৈনিক
অভ্যস্ত শৃঙ্খলা; ক্রমে
স্পষ্ট হয় হাঁ-মুখ গহ্বর;
টুকরো মুহূর্তের খণ্ড
রেখাচিত্র ক্রমশ অলীক
হয়ে ওঠে; ব্যবধান
ভরে তোলে স্তব্ধ অবসর।
মানুষ থাকে না। থাকে
পদচ্ছাপ, আলতা বা চন্দন,
শূন্য দেয়ালের কোলে
এক উজ্জ্বল প্রতিকৃতি।
বৎসরান্তে তাজা ফুল,
গন্ধধূপ, মাল্যের বন্ধন
আর-যা, হঠাৎ হাওয়া;
মন-কেমন-করে-ওঠা স্মৃতি।

অভ্যস্ত দিনানুদৈনিকের পাংশু প্রত্যাবর্তের ফাঁকে, একদা উজ্জ্বল জীবনপ্রতিকৃতি, ক্ষয়গামী চন্দনরের গন্ধ, অস্পর্শ ব্যবধান জীবন আর মৃত্যুর, এতসব স্ববিরোধের মাঝখানে বয়ে যায় হঠাৎ হাওয়ার কান্না, সে বড়ো ব্যক্তিগত। সেই কান্নার শোককে সাঁতরিয়ে উঠে আসে শ্লোকের অপূর্বকল্পিত অবয়ব যার রন্ধ্রে রন্ধ্রে রয়েছে স্মৃতির বিচিত্র কারুবাসনা।

এই যে এক জীবনযাপনের মধ্যে প্রনষ্ট দাম্পত্যের স্মৃতিরেখা, একজন রয়েছেন বেঁচে আর একজন প্রয়াত, তার মধ্যে দৈনন্দিনের অবিনশ্বর দোলাচল কত অনিবার্য অথচ মর্মান্তিক তার কবোষ্ণ রূপায়ণ 'ভোরনামচা' কবিতার প্রথম স্তবকে এইভাবে—

ভোরর প্রথম চায়ের কাপে, আবছা ধোঁয়ার কুণ্ডলীতে
টিউবে পেস্ট, গ্লাসের জলে মাজন-বুরুশ ভিজিয়ে নিতে,
জিভের ওপর অর্ধধনুক, জলের ঝাপটা চোখের কোলে,
তোয়াল-দিয়ে-আড়াল মুখের আড়ালে যে-আয়না ঝোলে
সে-আয়নাতে আরেকটি মুখ—বাজার করার ফর্দ হাঁকে,

একেই বলে লিপিকুশলতা আর দ্রুতগতি ছন্দের রেখায় ছবি আঁকা। চকিতে এসে সরে যায় দর্পণে আর এক মুখের স্মৃতি, এক সংসারিনির। তারপরে প্রতিদিনের ভোরনামচায় দেখতে পাই—

কাগজ খুলি। সেই তো খবর, টি.ভিতে যা আগের রাতে,
চোখ-বোলানো চোখ থেমে যায় শোক-কলমের পৃষ্ঠাটাতে

আশ্চর্য এই ভোর, যেখানে জীবনের মোহমুগ্ধ পরিচর্যার আগেই চোখ আটকে যায় মৃত্যুসংবাদে মন্থর শোক-কলমে। কবির তো এমন দৈনন্দিন ছিল না। আপনজনের মৃত্যু ঘটনা এখন তাকে

কেবলই টানে মৃত্যু-সরণির দিকে যেখানে 'বহু চেনা মুখের প্রিয় আদল', বন্ধুবিদায়ের সংরক্ত অনিবার্যতা। 'সেইদিন এইদিন' কবিতায় তাই আমরা দেখতে পাই—

অজস্র স্বপ্নের টুকরো, শুধু নেই একটিও মুখ।

একদিকে ভয় অন্যদিকে ভালোবাসার টানাপোড়েনে একদা যে বর্ণিল জামদানি-জীবন নির্মাণ করা গিয়েছিল আজ তা একদিকে উদ্বেগ আর একদিকে পিছুটানের নতুন নকশায় কেন যেন রহস্যময়, করুণ। অথচ,

এটা ঠিক যে, আমরা ফুটে উঠতে চেয়েছিলাম
একান্ত একটা নকসা হয়ে।
তুমি মিশিয়েছিলে আলতা ও সিঁদুরের সঙ্গে
রক্তের সবটুকু লাল।
আমি এনেছিলাম সাদা, আমার যাবতীয় অর্জন,
শক্তি, স্বেদ ও মর্ম।

রক্তিম স্বপ্নের সঙ্গে শুভ্র মর্মরস মিশে জীবন মেলে ধরছিল 'স্বপ্নের পাঁপড়িতে জমে-থাকা শিশিরের মতন অসহ্য সুখের বিন্দু' অথচ সেই নকশাটাই ধ্বস্ত হয়ে কবিকে বোঝাল এই নির্মম পাঠ যে,

পিছনে-পিছনে যাদের আসার কথা
আজ দেখি প্রত্যেকে
পেরিয়ে গিয়েছে দৃশ্যের সীমারেখা
আমাকে পিছনে রেখে।

কিন্তু তবু প্রণবকুমার এইসব কবিতায় ঠিক এলিজি লিখতে চাননি। তাঁর কবিতায় এক দমচাপা বিয়োগবেদনার স্রোত বয়ে

যায় কিন্তু কবির মন জীবনগ্রাহী, সমুৎসুক ও পর্যবেক্ষণরত। বইয়ের ব্লার্বে যেমন লেখা হয়েছে তা ঠিকই যে এসব রচনা "শুধুই প্রচলিত এলিজি, স্মরণ কিংবা শোকতর্পণ নয়। বিচ্ছেদ এখানে ব্যক্তিগত হয়েও সর্বাত্মক, সামাজিক, চিরকালীন।" সন্দেহ করি ব্লার্ব রচনায় দীর্ঘকালের দক্ষ প্রণব এই বইয়ের ব্লার্বটিও লিখেছেন—তাঁর আত্মভাষণ। এলিজি বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ লিখেছেন: "শোক: গভীরতম দুঃখ। তার আদি কারণ যে কোনো মরা মানুষ নয়, তার উৎস যে মানুষেরই নিজের মধ্যে, সে দুঃখ যে তার অস্তিত্বেরই গভীরতম নির্যাস এ ধারণায় কোনো সংশয় থাকে না।" এমন অন্তর্নিবিষ্ট শোককে টেনে আনে অবশ্যই কোনো মৃত্যু, কবি তাতে সাড়া দেন। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের এক অনবদ্য সনেট। যার বিষয় হল নিজেরই নষ্টজাত সন্তান। বিষয়টি চমকপ্রদ শুধু নয় অপূর্বকল্পিতও বটে। যে-সন্তান জন্মালই না, তাকে ঘিরে প্রত্যাশা-মায়া-স্বপ্ন যখন ততটা গড়ন পায়নি মনের গভীরে, তখন তার মৃত্যু ('নষ্টজাত' শব্দটি আশ্চর্য) না কি অনাবির্ভাব দেখে শক্তি লেখেন:

ঠিক কী কারণে গেল বোঝা ভার, কিন্তু গিয়েছে সে

অচরিতার্থ সেই জীবনাপিণ্ড সম্পর্কে এবার বর্ণনা :

একমুঠি স্পষ্ট মাংস ঠাণ্ডা-হিম যেমন প্রকৃতি
পাংশু ও নিশ্চেতন তেমনি সে মৃত্যুর লাঞ্ছিত সদাগর
কিংবা যেন আমারই মুখের অনুকৃতি

সম্পৃক্তি-অসম্পৃক্তি মেশানো অনুভব কবির। সেই সঙ্গে এটাও কবির জানা যে নষ্টজাত সন্তানের জন্য আততি থাকলেও স্মৃতি কাজ করবে না ভবিষ্যতে। তাই—

ভুলে যাব, ভাড়াটে যেমন ভোলে পরাশ্রয়, পেলে অবশ্য নতুন
শুধু মাঝে মাঝে অযুক্তি-কল্লোলে ভেসে উঠবে
মাংস, মুখ নিদ্রাতুর, বিষন্ন করুণ।

চিরনিদ্রাতুর বিষন্ন এক মাংসপিণ্ড। জীবনলক্ষণে রিক্ত কিন্তু তাতে ফুটে আসে পরম্পরার অনুকৃতি! এই হল এলিজি।

এর পাশে প্রণবকুমার তাঁর অনেক কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছেন অন্যরকম ছবি আর সেইসব ছবি চোখের জলের স্রোতে আঁকা। তাতে স্বজন ছাড়াও আত্মীয় বন্ধু নাট্যকর্মী সংগীতশিল্পী সবাই আছেন। সেইজন্যই শোক ওখানে সর্বাত্মক ও সমাজস্পর্শী, আত্মবেদনায় বলয়িত নয়। তাই মৃত্যু তাকে শুধু মুমূর্ষা আর সন্তাপ উপহার দেয় না, অলক্ষে হয়তো গেঁথে তোলে মৃত্যুবিজয়ী অম্লান মালা। কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় বা মোহরদির মৃত্যু নিয়ে এখানে একটি কবিতা রয়েছে 'দিনলিপি থেকে : ৫ এপ্রিল, ২০০০'। কাচের গাড়িতে ঢাকা মোহরদির দেহ এক শান্তিনিকেতন থেকে চিরপ্রশান্তির নিলয়ে চলে গেছে, রবীন্দ্রসদনের সামনে 'সুন্দরের সেই প্রতিমাকে' দেখে কবির:

এক মুহূর্তের জন্য ঝাপসা চোখ সেদিকে তাকিয়ে
পরমুহূর্তেই ভাবি, পড়ে রইল যে গুঢ় সঞ্চয়
সে তো জীবনের কাছে মৃত্যুর নিজেরই পরাজয়।

অসংখ্য নতুন জন্ম প্রতিটি মুহূর্তে তার আনন্দধারায়, গানে গানে। শেষতক কবির ধারণা গড়ে ওঠে যে,

আনন্দ-আবিষ্ট মন বারবার বলে উঠতে চায়;
মধুর তোমার শেষ নেই, শুধু প্রহর ফুরায়।

কণিকার পিঠোপিঠি যে-কবিতাটি খুঁজে পাই তাতে কিন্তু মাধুর্যের

বদলে কবির অন্য একরকম মনস্তাপ জেগে ওঠে অন্য একজনের মৃত্যু ও মৃতদেহ দেখে। 'তর্পণ' নামের সেই কবিতায় অনুক্ত হয়ে আছে এক প্রয়াত কবির নাম। তাঁর প্রয়াণ পরবর্তী বাতাবরণ দেখে প্রণব বোঝেন:

না, শুধু কবিতা নয়। স্পষ্ট করে বলে দেওয়া চাই
তুমি কোন্ দলে।
ভাষা তো একটাই আজ। সে-ভাষায় থাকে যদি সায়,
এই তোমাকেই
ঢেকে দেব শিরোপায়, ছবি করে রাখব পতাকায়।
নইলে, কেউ নেই
কী লিখেছ ভুলে যাব। প্রতিটি অক্ষর মূল্যহীন
নতুন মিছিলে।
ভুলে যাব, স্বপ্নে-বোনা কোন্ লাল টুকটুকে দিন
তুমি চেয়েছিলে।
আর প্রতিবাদ নয়। আজ শুধু অন্ধ সমর্থন।
যদি দিতে পারো,
লক্ষ তোপধ্বনি দিয়ে আমরাই ঘটাব নিরঞ্জন
হ্যাঁ, এই তোমারও।
পারো নি। এখন তাই নিঃসঙ্গ শয়ান কাচঘরে

এখানে স্বভাবশান্ত প্রণবকুমার শোককে ছাপিয়ে ক্ষোভে বিমর্ষ। তাঁর অবলোকনের দর্শন যেন দেখতে পায় শুধু কোনো মৃতদেহ নয়, বরং

মৃত্যু ও মিথ্যের দিকে পিঠ-ফেরানো বুকের উপরে
একরোখা আঙুল।

কবির শিল্পকৌশল এটাই যে প্রয়াত কবির নাম কোথাও নেই কিন্তু তাকে সনাক্ত করতে অসুবিধে হয় না। প্রণবের বন্ধুভাগ্য ভালো, কিন্তু তার মরমি মন এই ভেবে দিশাহারা যে সেইসব বন্ধু বা বন্ধুবৃত্ত কেন ভেঙে যায়—মৃত্যু আঘাত আসে কিন্তু তাতে কোনো দৈবপরশ তিনি খুঁজে পান না রবীন্দ্রনাথের গানে যেমন থাকে। তাই পথে চলে যেতে যেতে কখন কোন্‌খানে যে জেগে ওঠে সেইসব প্রিয় মুখ, যারা প্রয়াত কিন্তু যেন চিরঞ্জীব। কেমন অনায়াসে পড়ি:

ওই তো মিহির, ওই তো বরেন, আর
এলোমেলো চুল...নিখিল না? দূরে-কাছে
এক দঙ্গল বন্ধু গল্পকার,
সাদা-পাঞ্জাবি তুলসীও বসে আছে

আশ্চর্য যে যেমন জীবিতকালে একদঙ্গল বন্ধু গল্পকার জমিয়ে আড্ডা দিতেন এবং তার স্রষ্টা ছিলেন প্রণব, এখনও এই কবিতাতে যেন তাঁরাই বসে আছেন—সেই মিহির মুখোপাধ্যায়, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, নিখিলচন্দ্র সরকার আর তুলসী সেনগুপ্ত। এই কবিতার সদ্য উপলক্ষ ছিল সকালে হঠাৎ পাওয়া এক ফোনবার্তায় বন্ধু তুলসীর মৃত্যুবৃত্তান্ত। যেন প্রয়াত বন্ধুদের গ্যালারিতে সাদা পাঞ্জাবি পরা নতুন সদস্য তুলসী এসে বসেছেন। কবির জীবন এখন ত্রস্ত মৃত্যুসংবাদে অপেক্ষাতুর—তুলসীর সংবাদটুকু পেয়ে 'ফোনটা নামিয়ে চুপ করে বসে থাকি' আর মনে হয়—

এই তো সেদিন। তবু আজ স্মৃতি সবই।

ক্রমশ সুদুর প্রতিটি মুখের ছবি।

থেকে-থেকে মাঠে-মাঠে।
আচম্‌কা ফোনে বেজে ওঠে চলে-যাওয়া।

চলে যাওয়া দেহ, শুনে থম মেরে বসে থাকা, অথচ প্রবহমান জীবনের ধারোষ্ণ স্রোতাবর্ত। তাই—

বসে-বসে দেখি জানলা দিয়ে:
একফোঁটা দু'ফোঁটা বৃষ্টি পড়েছে কি পড়েনি, মায়াবী
অথচ অমোঘ স্পর্শে গাছগুলি সটান দাঁড়িয়ে;
প্রাণের ভিতরে প্রাণ, আলো-গান, সুরের সরোদ।

এই হল মৃত্যুবলয় ভেদ করে অভেদ্য প্রাণের বৈজয়ন্তী। কিন্তু মৃত্যু তো কবির পিছু ছাড়ে না (গল্পকার বন্ধুর দলকে আড্ডারত দেখা মানসচক্ষে সেও তো একরকম পাওয়া) কিন্তু যে-মৃত্যুসংবাদ কোনোদিন সকালের দূরভাষে আগে আসেনি, সেখানে অভিঘাত বড়ো মর্মান্তিক। যেমন—

জুলাইয়ের আঠারো
আজ সকালের কাগজ খুলে অবাক। তোমার ছবি
দুইয়ের পাতার শোক-কলমে,—সামান্য রোগভোগে—
দেবর্ষি আর দেবলীনার নাম রয়েছে নীচে,
ছবিটা বেশ মাঝবয়সের, ভারিক্কি ভাব মুখে

এখানে সমাপতন এটাই যে ঠিক একবছর আগে ঠিক ঐ আঠারো জুলাইতেই সদ্যপ্রয়াতের সঙ্গে দেখা হয়েছিল নন্দন চত্বরে:

চলে যায়, যায়, যায় যায়
শরৎ-হেমন্ত-বর্ষা-শীত,
চতুর্দিকে কেবলই বিদায়
কেঁপে ওঠে ভিত।

বেঁচেবর্তে থাকার ভিত্তি কাঁপিয়ে দেয় যে-মরণ তাকে বোঝা কঠিন, তবু সেটাই জীবিত মানুষের করুণ ভবিতব্য। মানুষের অজানা এই রহস্যময় বেঁচে থাকা, আর—

নীচে জনস্রোত
ছুটে যায় দিকে-দিকে, কোন্ দিকে? জানে না। শুধু জানে,
যেতে হবে। পাশপাশি, তবু কাছাকাছি নয়। আজ
দুঃখগোপনের দুঃখ বুকে নিয়ে চলেছে মানুষ।

এই হল সৎ কবির সত্যদর্শন। এর প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র উচ্চারণ এক একটি সত্য অনুভবকে মেলে ধরে। না জানা দিশায় ছুটন্ত মানবস্রোত, যাওয়াটাই সত্য—বিভূতিভূষণ যেমন বলতেন, 'গতিই জীবন—গতির দৈন্যই মৃত্যু'—তেমনই নিরন্ত চলা। পাশাপাশি কিন্তু কাছাকাছি নয় এইজন্য যে প্রত্যেক ব্যক্তির দুঃখলব্ধ অভিজ্ঞতা আলাদা কিন্তু দুঃখগোপনের নিয়তি সকলেরই। শুধু তফাত এটাই যে প্রণবকুমারের মতো অন্তঃশায়ী প্রতিভার কবি তার দুঃখগোপনের দুঃখ ভাগ করে নিতে পারেন মরমি পাঠকের সঙ্গে কিন্তু সব পাঠকের সঙ্গে নয়—সেইজন্যই তাঁর কবিতা তুমুল জনপ্রিয় নয়। তাঁকে বুঝতে তাঁকে খুঁজতে তাই দেরি হয়ে যায়।

প্রণবকুমারের স্মৃতিভিক্ষু কবিতার নানা পঙ্‌ক্তি আমাদের নতুন বোধের আলোয় সাজায়। যে চলে গেছে তাকে আমরা চিরাভ্যস্ত রুটিনবাঁধা কাজে ডুবে ভুলতে চাই, ভুলে থাকতে পারিও হয়তো। কিন্তু এই কবির কাছ থেকে জানতে পারি—

আমি তাকে ভুলে থাকি। থাকতে চাই। সে তবু ভোলে না।
রৌদ্র থেকে, ছায়া থেকে, মেঘলা থেকে সেই চিরচেনা
ছায়া নেমে আসে।

অন্যোন্য এই স্মৃতির খেলা। জীবিত মানুষের মতো স্মৃতিরও তৃষ্ণার্ত মর্মমূল কবিতার ছায়া মেলে ধরে সন্তপ্ত জনের মনে। এমন তার সঞ্জীবনী রস যে মুগ্ধ জীবনের টানে মানুষকে টানে ইহবাদে। বাঁচার কুহক এত তীব্র যে কবেকার মরে যাওয়া বন্ধুদের ঠিক মৃত্যুপ্রতীতির অদৃশ্য ঘেরে আটকে রাখা যায় না। তারা উঠে আসে বহুজনতার মাঝখানে। যেন জাদু বাস্তবের মতো কবির মনে হয়—

বিমল দাঁড়িয়ে ছিল ট্রামস্টপে, স্পষ্ট মনে আছে।
...বিমল দাঁড়িয়ে ছিল একা,
তেমনি উজ্জ্বল চোখে কৌতুক-মেশানো হাসি, ছিল
রঙিন পাঞ্জাবি, ছিল সটান তরুর মতো দেহ,
বিমল দাঁড়িয়ে ছিল, অবিকল বিমলের মতো।

দেখা না দেখায় মেশা ও এক কল্পদৃশ্য, কবিতার মতো মনোরম ভ্রমাত্মক কিন্তু সজীব। সত্যিই লেখক বিমল রায় চৌধুরীর অকালমৃত্যু যেন অবিশ্বাস্য। ঠিক তেমনই অভিনেতা বন্ধু শ্রীমণ্ডিত শরীরের অরুণ রায় যে বেঁচে নেই তা মানা যায় না বলেই, কবি দেখতে পান—

চলন্ত ট্যাক্সির থেকে অরুণ বাড়িয়ে দিল মুখ,
তেমনি গভীর কণ্ঠ: কী খবর, কোথায় যাবেন?
পাথরে খোদাই করা মূর্তি এক সুঠাম, পেশল,
অরুণ দাঁড়িয়ে ছিল, অবিকল অরুণের মতো।

এমন লুকোচুরি খেলা কেবল অবিশ্বাস্যভাবে প্রয়াতদের নিয়েই বুঝি শুধু খেলা যায়। কিন্তু প্রযুক্তিবিদ বন্ধু সুবন্ধু যখন আত্মহত্যা করে তখন প্রণবের অনুভব আরেকটা দর্শনে আরোহণ করে, আরেকরকম আত্মপীড়নের ছকে। কবি বোঝেন—

উৎকোচে-উত্ত্যক্ত এক গ্লানিময় জীবনের ভার
বহন-অযোগ্য বলে মনে হয়েছিল তার, তাই
শান্ত প্রতিবাদে বেছে নিয়েছে যে মৃত্যুর আশ্রয়।

দক্ষ কবি তার অনুচ্চ বাচনে 'উৎকোচ-উত্ত্যক্ত' আর 'শান্ত প্রতিবাদে' শব্দ দুটি গেঁথে সুবন্ধুর আত্মহননের কারণটির দ্যোতনা দেন। কবির মনে হয়েছে এই বাধ্যতামূলক স্বেচ্ছামৃত্যুর দায় তো তাহলে আমাদের ওপরও এসে পড়ে। অসৎ সমাজের পরিসরে একজন সৎ প্রযুক্তিবিদ টিকতে পারেননি বলে এখন শান্ত প্রতিবাদ? কবির মনে প্রশ্ন—

কী বলবে মৃত্যুকে এই? আত্মহত্যা? না কি এক খুন?
...প্রত্যেকেই লিখে যায়:
'কেউ দায়ী নয়'।
লিখুক। তবুও যেন কোনো এক অগোচর দায়
মিশে থাকে এ-রকম প্রতিটি মৃত্যুতে। জেনো, তাই
যতই সহজে পড়ি 'আত্মহত্যা', পরক্ষণে সভয়ে তাকাই
নিজেদেরই দিকে। খুঁজে দেখি বারবার, দুই হাতে
কতটা রক্তের ছিটে লাগল এসে প্রতি ঘটনাতে।

কবি হিসাবে প্রণব সহৃদয় সামাজিক, ভালোমাপের মানুষ। তাই যে কোনো মৃত্যু যেন তার সত্তার এক এক অংশে ছোবল মারে। মনে আসে ছিন্নতার বোধ। কিন্তু মানুষটি আসলে তো আমগ্ন পারিবারিককতার শুভকারী আলিম্পনে পরিতুষ্ট স্বামী ও পিতা। সেইখানেই লেগেছে মৃত্যুর দংশন, মানুষটিকে করে দিয়েছে নির্বাস ও স্মৃতিজীবী। সন্তানের প্রতি যৌথজীবনের প্রত্যাশা বীজ থেকে ফুলেফলে পূর্ণ হয়নি। আর সবচেয়ে কাছের মানুষটির

চিরবিদায় বর্ণনা কত যে মর্মস্পর্শী অথচ শিল্পময় মিতভাষণে সুন্দর তা বলতে কষ্ট হয়। এমন শোকাতুর শ্লোক কজন লিখতে পারেন যে,

এই হাতে স্নেহ ছিল, ও হাতে শাসন।
দুই চক্ষু জুড়ে
চন্দনাক্ত তুলসীপাতা হরণ করেছে যাবতীয়
মুগ্ধতা-উদ্বেগ।

লবণার্দ্র অনুতাপ কেবলই ছাপিয়ে যায় কপোল, চিবুক।

জল, তবু দগ্ধ-করা, তীব্রতাপ, হিংস্র হুতাশন।

কাটা কাটা দ্যোতনাময় শব্দচিত্তে নিখুঁত কবিতা। কবি জানেন আগুনে-খোলসে প্রাণপণ যুদ্ধ শেষ হতে তিন-চার ঘণ্টা লাগে, থেকে যায় তাপ-ক্ষোভ-ক্ষয়। শ্মশানকলস ভাঙা, রেখে আসা শেষ পিছুটান, তারপরে নতুন আদলে নতুন জীবনছাঁচ গড়ে তোলা। কিন্তু তবু দিনানুদৈনিকের আবর্তনের ফাঁকে ব্যক্তিগত পরিসরে বয়ে যায় স্মৃতির হাওয়া। সেই অনুভব:

অক্ষরে পড়ে না ধরা, ধরা দেয় অশ্রুর আভাসে।

এবং এটাই চরম সত্য বলে প্রতিভাত হয় যে 'মানুষের কিছু যুদ্ধ একান্ত একক, ব্যক্তিগত'।

এই দোলাচলে সুভদ্র সামাজিক কবি কোন্ পথ বেছে নেবেন? জীবন না মৃত্যু? সৌন্দর্য না হিংস্রতা? মুগ্ধতা না বৈরাগ্য? মনের অন্তঃস্থলে বেজে ওঠে ভিজে ভৈরবীর অরুন্তুদ সুরে,

স্বপ্নে-জাগরণে এক গভীর পাতাল, যেন কেউ
হাতছানি দিয়ে ডাকছে : 'ঝাঁপ দাও এখানে, অথবা
ভুলে যাও কিছু-কিছু। জেনো, কিছু ভুলে যেতে হয়,
এই পৃথিবীতে কোনো জাতিস্মর আজ বেঁচে নেই।'

কালের প্রহারে সময়ের স্রোতে কিছু কিছু বিস্মৃতির ঢেউ মুছে দেয় স্মৃতির লাবণ্যধারা। সফলতা-নিষ্ফলতা, উদ্যম-আলস্য, অতীত-বর্তমান, জীবন-মরণের সীমা ছাড়িয়ে তবু তো এক অভ্রান্ত সত্য থাকে, থেকে যায়। আগুন জল, তীব্রতাপ, সংহার ও শ্মশান-কলসের অবিকল্প আয়োজনের পরিসরে অদম্য উদ্ভিদের মতো বেঁচে ওঠার তাপে কবিকে শেষ পর্যন্ত বলতেই হয় :

জন্মান্তরে আস্থা ছিল না, তবু এই বিশ্বাসে
আজ চলে যেতে চাই :
আগামী জীবনে যেন ফিরে আসে, ঘিরে থাকে চারপাশে।
এই সব মুখ, এই সব ছবি, এই পুরো স্মৃতিটাই

মানুষের এই শেষ শস্ত্র: জিজীবিষা। কবিরও।

'কবিসম্মেলন', অক্টোবর-নভেম্বর ২০০৯-এ প্রকাশিত

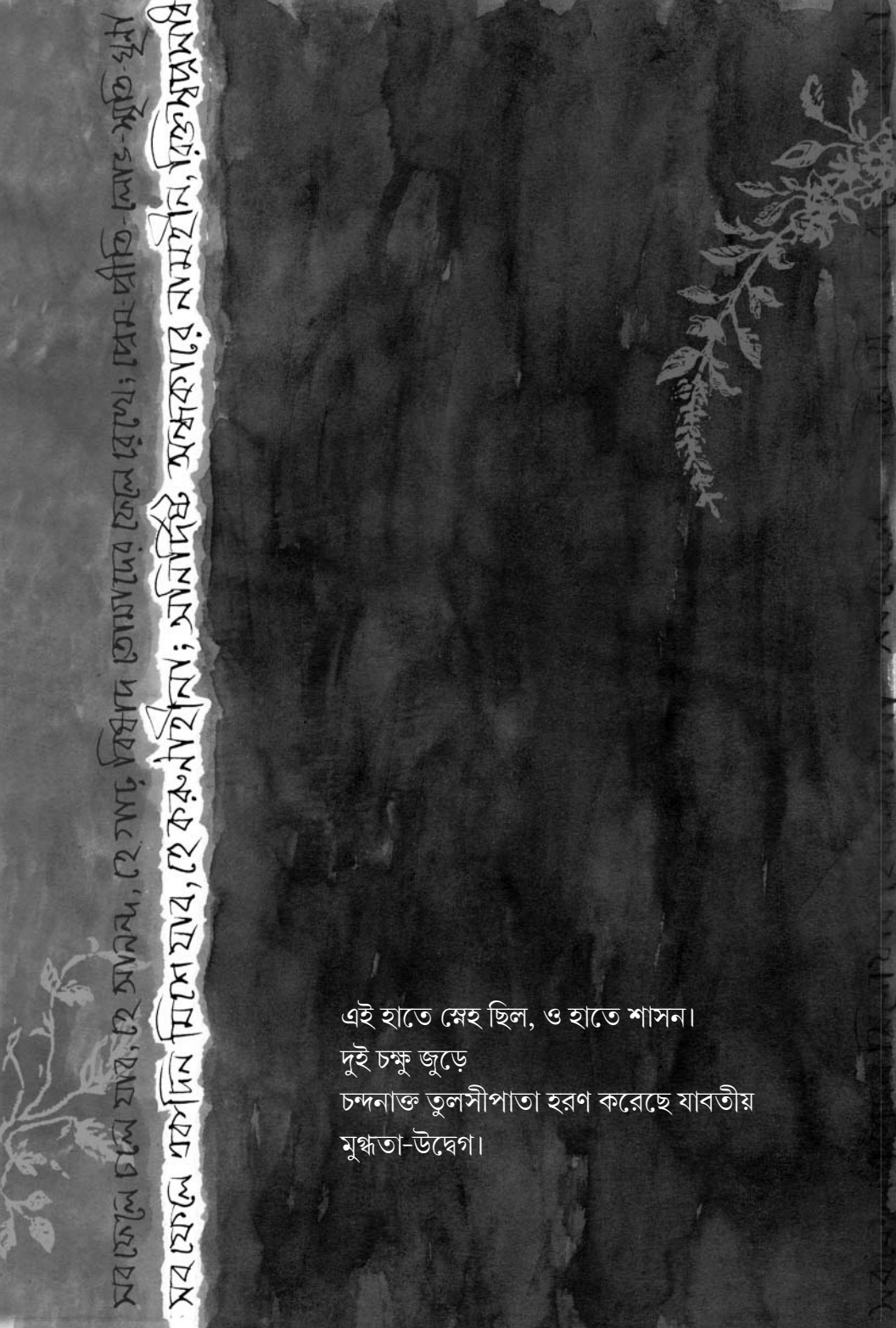

এই হাতে স্নেহ ছিল, ও হাতে শাসন।
দুই চক্ষু জুড়ে
চন্দনাক্ত তুলসীপাতা হরণ করেছে যাবতীয়
মুগ্ধতা-উদ্বেগ।

রেডিয়োয় কবিতাপাঠে প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

গভীর বেদনায়, সুখের স্মৃতিতে

বিভাস চক্রবর্তী

করোনা বিশ্বব্যাপী দুঃখের কারণ হয়ে উঠেছে। সে আমাদের নিত্যসঙ্গী হয়ে থেকে যাবে কিনা, সেটাই এখন চিন্তার কারণ। কিন্তু নিতান্ত কাছের দুঃখ, নিকট দুঃখ আমাদের কাছে অনেক বড়ো হয়ে ওঠে, থেকে যায়, কারণ সে-দুঃখ কতজনের সঙ্গে, কতটাই-বা ভাগ করে নেওয়া যায়। সে-দুঃখ তাই নিজের মধ্যেই গুমরে মরে। এই সময়ের মধ্যে অনেক প্রিয়জন আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। কবি প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায় সেরকমই এক আপনজন

এবং কৃতি মানুষ। এত কুটকচালি নিয়ে পাতা ভরাতে বা মাথা ঘামাতে হয় যে, একটি সংবাদপত্র ছাড়া অন্য কেউ বুঝি আর জায়গা বা সময় করে উঠতে পারেনি একজন কবির প্রয়াণের খবর দিতে, যিনি ওদের ভাষায় হয়তো বর্তমানে সার্কুলেশনের বাইরে। দুঃসংবাদটি জানিয়েছে আমার থিয়েটারের প্রিয়জন রজতেন্দ্র।

বয়েসের দিক থেকে আমার সমসাময়িক ছিলেন প্রণবকুমার। আমি কবিতাবোদ্ধা নই, কিন্তু তাঁর কবিখ্যাতি তাঁকে পরিচিত করেছিল আমার কাছে। কবিতার বই কেনার বা গোগ্রাসে পড়ার খুব একটা অভ্যেস ছিল না আমার। কিন্তু ওঁর কবিতা পড়েছি পত্র-পত্রিকায়, শারদ সংখ্যাগুলিতে । ওঁর কবিতা বেশ বুঝতে পারতাম, জোরটা অনুভব করতে পারতাম। কিন্তু ওঁর গদ্যের সঙ্গে পরিচয় ওঁর লেখা নাট্য-সমালোচনার মাধ্যমে। 'দেশ' না 'আনন্দবাজার' মনে পড়ছে না, আমার একটি 'থিয়েটার ওয়ার্কশপ' প্রযোজনা নিয়ে ওঁর আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। তারপর ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ হয় কোনো একটা সূত্রে। তার পরও উনি একবার একটি আলোচনা প্রসঙ্গে খেদ করেছিলেন, আমি কেন অভিনয় করা ছেড়ে দিয়েছি, সেই কারণে। তাঁর গদ্য আমার পছন্দের ছিল, কারণ তিনি যা বলতে চাইতেন, বলতে পারতেন সহজসুন্দর ভাষায় সোজাসাপটা এবং স্পষ্টতার সঙ্গে। উনি গান এবং ম্যাজিকের প্রখর সমঝদার ছিলেন, সে-সম্পর্কিত আলোচনাও পড়ার সুযোগ হয়েছে আমার। দেখা কম হত, টেলিফোনেই বন্ধুত্ব, টেলিফোনেই কথাবার্তা। নানা বিতর্কিত বিষয়ে আলোচনার সময় টেলিফোনে ঝড়ও উঠত।

মতামত সজোরে ব্যক্ত করার মানুষ, চেপে যাবার নয়। বিশেষ করে নন্দীগ্রাম-সিঙ্গুরের সময় বাক্যবিনিময় বেশ জমে উঠত। কথাবার্তায় সরসতা ছিল, পরিহাসপ্রিয়তা ছিল, রাগ ছিল, যেটা আপন হতে সাহায্য করেছিল আমাকে। কবি, লেখক এবং মানুষ হিসেবে অনুরাগী ছিলাম ওঁর। অনুরাগ এবং পক্ষপাতিত্ব বেশি ছিল তিনি থিয়েটার দেখতেন, বুঝতেন এবং থিয়েটারের মানুষকে ভালোবাসতেন বলে।

আমি গলফ গ্রিনে থাকি, উনি থাকতেন খুবই কাছাকাছি—যোধপুর পার্কে। তবুও আসা-যাওয়া হত না—এরকমটাই হয়ে থাকে। শেষ কোনো একটি নাটকের অভিনয় আমরা দুজনেই দেখতে গিয়েছিলাম—খুব সম্ভবত মধুসূদন মঞ্চে। তখনই বেশ অসুস্থ ছিলেন। ওঁর প্রতিবেশী অগ্রজ কবি প্রয়াত সমরেন্দ্র সেনগুপ্তর পুত্র রাহুল সেনগুপ্ত এবং রজতেন্দ্র-র মাধ্যমে ওঁর খবরাখবর পেতাম মাঝে-মাঝে। শেষ সময়টায় রাহুল এবং পুত্রবৎ সুব্রত গুহ পাশে ছিল।

প্রণবদা

দেবাশীষ দেব

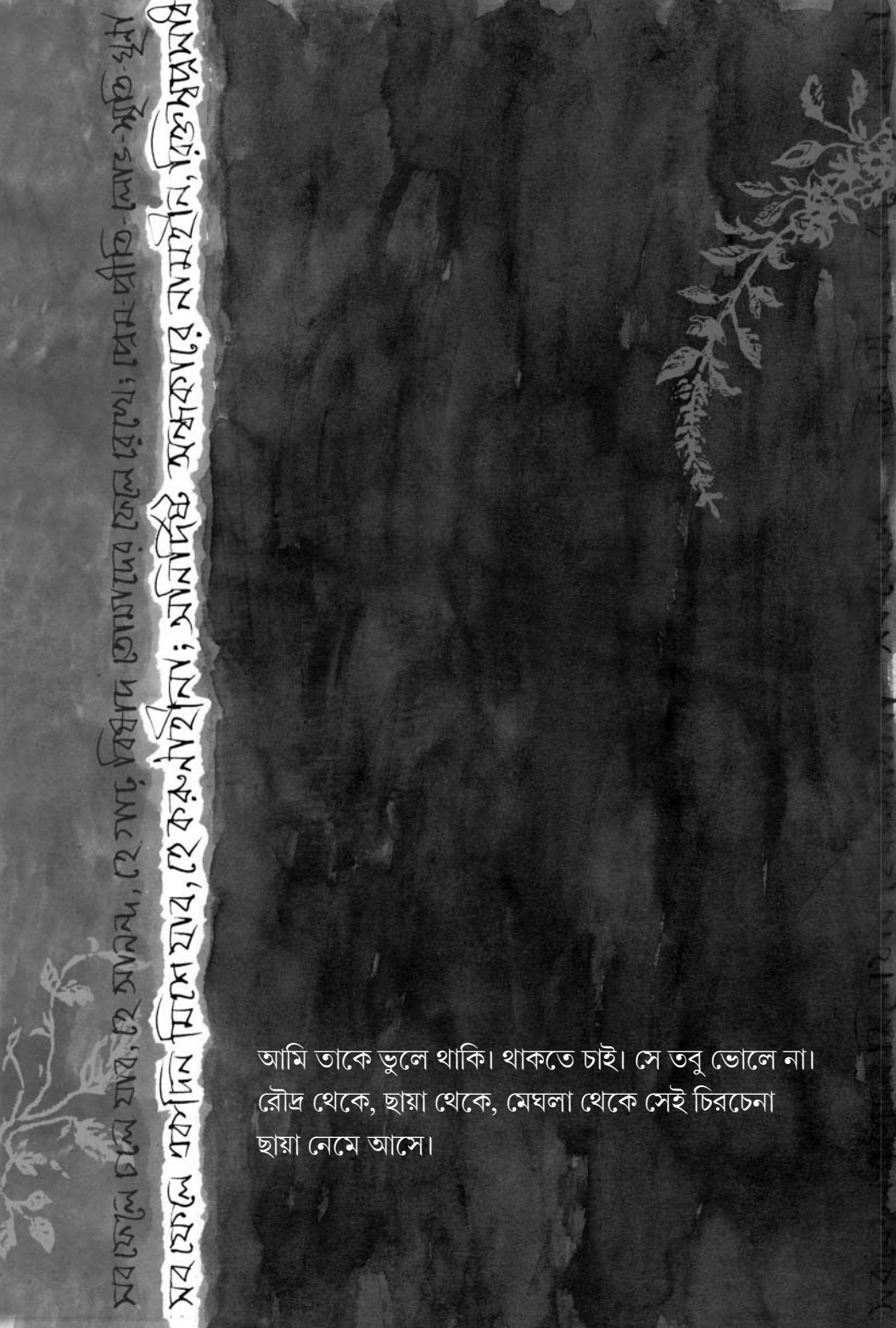

আমি তাকে ভুলে থাকি। থাকতে চাই। সে তবু ভোলে না।
রৌদ্র থেকে, ছায়া থেকে, মেঘলা থেকে সেই চিরচেনা
ছায়া নেমে আসে।

সবান্ধব প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রণবদা

কৃষ্ণেন্দু চাকী

প্রণবদার কবিতা নিয়ে এই মুহূর্তে কিছু লিখতে ইচ্ছে করছে না। ইচ্ছা করছে না তাঁর ছড়া লেখার অসাধারণ হাত নিয়েও কিছু লিখতে। সেসবের জন্য সময় তো রইলই। তিনটে দশকেরও বেশি সময় ধরে তাঁর সঙ্গে মেশার ফলে,আজ এই মুহূর্তে এত স্মৃতি একসঙ্গে ভিড় করে আসছে যে, কোন্‌টা লিখব আর কোন্‌টা লিখব না, সেটা ঠিক করে ওঠাটাই এখন সবচেয়ে কঠিন একটা কাজ।

প্রণবদার সঙ্গে আমার আলাপ 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য়, উনিশশো পঁচাশি বা ছিয়াশি সালে।আমি তখন সদ্য চাকরিতে ঢুকেছি। সেই সময় আনন্দ পাবলিশার্স থেকে যত বই প্রকাশিত হত, সেগুলোর প্রত্যেকটার ব্লার্ব উনি একাই লিখতেন। তখন অবনীন্দ্রনাথের ছোটোদের জন্য লেখা বইগুলো আনন্দ থেকে আবার নতুনভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। আমি *নালক* বইটার মলাট আর ভিতরের ছবিগুলো আঁকছি।সেটা শুনে, উনি নিজেই আমার কাছে এসে ছবিগুলো দেখতে চাইলেন, ওঁর ব্লার্ব লেখার সুবিধার জন্য। সেই প্রথম আলাপ। সেটা যে কখন কীভাবে ঘনিষ্ঠতার পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল, তা আমি বা প্রণবদা কেউই কখনো ঠিক বুঝতে পারিনি।

তখন প্রণবদা প্রায় রোজই 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র অফিসে আসতেন। উনি নিজে উচ্চপদস্থ সরকারি চাকরি করলেও ওঁর অধিকাংশ বন্ধুবান্ধবই তখন 'আনন্দবাজার'-এ কর্মরত। 'দেশ'-এ সুনীলদার ঘরে সন্ধের দিকে যে-আড্ডাটা বসত, সেখানে প্রায় দিনই প্রণবদা থাকতেন। সুনীলদা শীর্ষেন্দুদা জয় পার্থদা দিব্যেন্দুদা বাদলদা সিরাজদা ও আরও অনেকে মিলে খুব জমজমাট একটা আড্ডা রোজই 'দেশ'-এর ঘরে হত। প্রণবদা সেখানেও থাকতেন আবার চারতলায় রমাপদবাবুর ঘরের আড্ডাতেও ওঁকে প্রায় নিয়মিত দেখা যেত। খুবই মিশুকে ছিলেন প্রণবদা।আমরা যারা ছবি আঁকতাম, তাদের সঙ্গেও খুব ভালো সম্পর্ক ছিল ওঁর। খুব ভালোবাসতেন প্রবীরদা, মানে প্রবীর সেন আর আমাকে। কত সময় যে অফিসে বসেই আমাদের সঙ্গে কত গল্প করেছেন, তার আর কোনো হিসাব

নেই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমরা হাঁ করে প্রণবদার মুখে গল্প শুনে গেছি। উনি এত সুন্দর গল্প বলতে পারতেন ভাবা যায় না। আর সে যে কত রকমের গল্প! 'কৃত্তিবাস'-এর প্রথম যুগের সব নানারকম মজার ঘটনা, তাছাড়া বিভিন্ন শিল্পী ও কবি-সাহিত্যিক, যাঁরা ছোটোবেলা থেকেই আমাদের হিরো, তাঁদের জীবন আর কাজ নিয়ে অজস্র রকমের গল্প আর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা একনাগাড়ে বলে যেতে পারতেন প্রণবদা। যা দীর্ঘ সময় ধরে শুনলেও, আমাদের এক মুহূর্তের জন্যও ক্লান্তি আসত না। যেমন ঠিক এই মুহূর্তে মনে পড়ছে বেসামাল পৃথ্বীশদাকে (পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়) গভীর রাতের শেষ ট্রামে তুলে দেওয়ার গল্পটা। ট্রামের কন্ডাক্টর পৃথ্বীশদাকে কিছুতেই ট্রামে উঠতে দিতে চাইছেন না, আর প্রণবদা ট্রাম থামিয়ে তাঁকে প্রাঞ্জলভাবে বুঝিয়েই চলেছেন, পৃথ্বীশদার প্রতিভা এবং সৃষ্টিশীলতা সম্পর্কে। পৃথ্বীশদা ঠিক কতটা গুণী একজন শিল্পী এবং অনুভূতিশীল মানুষ এ বিষয়ে কন্ডাকটর সহমত না-হওয়া অবধি প্রণবদা থামেননি। কন্ডাকটরের হাতে ভাড়া গুঁজে দিয়ে পৃথ্বীশদা সমেত ট্রামটা চালু করানো পর্যন্ত অবিচল ছিলেন।

এটা সত্তর দশকের কথা।ওই কলকাতা আর কখনো ফিরে আসবে না।

আমাদের এই সব আড্ডায় শিল্পী-সাহিত্যিকদের নিয়ে গল্প ছাড়াও প্রায় অনিবার্যভাবেই শেষ পর্যন্ত এসে পড়ত ম্যাজিকের কথা। ম্যাজিক নিয়ে প্রণবদার আগ্রহ, ঔৎসুক্য এবং উৎসাহের কোনো অন্ত ছিল না। নিজেও খুব ভালো ম্যাজিক বুঝতেন। ম্যাজিক সংক্রান্ত কত দুষ্প্রাপ্য বই আর পত্রপত্রিকার কথা যে

প্রণবদার মুখে শুনেছি তার আর শেষ নেই। এই ম্যাজিকের প্রসঙ্গে বারবার অজিতকৃষ্ণ বসুর নানা লেখার কথা বলতেন। আর গান সম্পর্কেও প্রণবদা ছিলেন একইরকম সমঝদার ও উৎসাহী। একসময় অনেক সংগীত-সমালোচনা লিখেছেন। বহু নতুন সংগীতশিল্পীকে নানা সময় উৎসাহ দিয়ে গেছেন ক্লান্তিহীনভাবে। অনেক সময়েই প্রণবদাকে দীর্ঘ সময় ধরে সাগরদার সঙ্গে রবীন্দ্রসংগীত নিয়ে আলোচনা করতে শুনেছি। শান্তিনিকেতন এবং সেখানকার মানুষজন সম্পর্কে ওঁর খুব দুর্বলতা ছিল। আড্ডার আকর্ষণ ছাড়াও ওই সময়টায় প্রণবদাকে কাজের জন্যও প্রায়ই আসতে হত 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য়।তখন 'আনন্দমেলা'র সম্পাদক ছিলেন নীরেনদা। ধাঁধা, মজা আর বুদ্ধির খেলা নিয়ে প্রণবদা নিয়মিত ছোটোদের জন্য লিখে চলেছেন সেখানে। আশ্চর্যের ব্যাপার, এই বিষয়টাতেও ওঁর অসামান্য দখল ছিল। দীর্ঘদিন ধরে একটানা লিখে গেছেন। ছোটোদের খুবই প্রিয় ছিল তাঁর ওই লেখাগুলো। এছাড়া সমালোচনা ও বিজ্ঞাপনের নানারকম লেখালিখির কাজও প্রায় সবসময়েই লেগে থাকত।

শিল্পীদের সঙ্গ প্রণবদা খুব ভালোবাসতেন। খুব খুঁটিয়ে মন দিয়ে দেখতেন সবার কাজ। একসময় পুর্ণেন্দুদা আনন্দ পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত ওঁর কাব্যগ্রন্থ *এসো হাত ধরো*-র প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন। সেটা ওঁর ঠিক কীরকম লেগেছিল এবং সেই বইটি ও তার বহু বছর পর ওই একই সংস্থা থেকে প্রকাশিত ওঁর আর একটি কাব্যগ্রন্থ *অপেক্ষার রং*-এর জন্য আমার করা প্রচ্ছদের তুলনামূলক আলোচনা আমার এখনো ছবির মতো

মনে আছে। খুব মন দিয়ে ওঁর কথা শুনতে শুনতেই আবিষ্কার করেছিলাম গ্রাফিক ডিজাইন সম্পর্কে ওঁর নিজস্ব ধারণা ও ভাবনার জগৎটাকে। এই বিষয়টিও ওঁর খুব প্রিয় ছিল এবং এটাকে উনি সম্পূর্ণ নিজের মতো করে দেখতেন। তা ছাড়া বইয়ের পুরো ব্যাপারটা, অর্থাৎ সেটার নির্মাণ, বিজ্ঞাপন এবং বিপণনের নানারকম উদ্ভাবনী দিক সম্পর্কেও প্রণবদার খুব স্পষ্ট একটা ধারণা ছিল। আমার ধারণা এগুলো সবই ডি. কে. অর্থাৎ দিলীপকুমার গুপ্তর সঙ্গে ওঁর এবং ওঁর সতীর্থদের একদা ঘনিষ্ঠতার ফল। শুরুর দিকে কৃত্তিবাস গোষ্ঠীর সঙ্গে ডি.কে.গুপ্তর ঘনিষ্ঠতার কথা আমরা সকলেই জানি। প্রণবদার মুখ থেকে ডি.কে.-র গল্প শুনতে যে কী ভালো লাগত, তা আর বলার নয়! 'বাটা' কোম্পানির বিজ্ঞাপনের জন্য পুর্ণেন্দুদাকে দিয়ে দিলীপকুমার গুপ্ত কীভাবে নিজের পছন্দমাফিক কাজটা করিয়ে নিয়েছিলেন, সে-গল্পটা যে কতবার প্রণবদার মুখে শুনেছি! সেই সব গল্পের কথা ভেবে আজও ভালো লাগে। কী জীবন্ত একটা সময়!

সম্ভবত উনিশশো ছিয়াশি বা সাতাশি সাল হবে, একদিন অফিসে প্রণবদা আমাকে ডেকে বললেন, "বেশ কিছু বই আর আমার কোনো কাজে লাগবে না। তুমি এত বই ভালোবাসো, তোমার লাগলে ওগুলো তোমাকে দিয়ে দেব।"

"আপনার কাজে লাগবে না কেন?" আমি জানতে চেয়েছিলাম।

"হয় আমার অন্য আরেকটা কপি আছে, নয়তো সেগুলো কোনো-না-কোনো সমগ্র বা সংকলন-এ রয়েছে। আমার এই

ছোটো ফ্ল্যাটে আর জায়গা হচ্ছে না। আমি সব আলাদা করে বেছে রেখেছি। পরশু, রবিবার সকালে আমার বাড়ি এসে যদি নিয়ে যাও তো ভালো। পরে এলে কিন্তু আর পাবে না।'

প্রণবদা আমার কাজ ফেলে রাখার স্বভাবের কথা জানতেন। সেই জন্য ওই ভাবে তাগাদা দিয়েছিলেন।

সময়মতো রবিবার সকালে প্রণবদার পাইকপাড়ার বাড়িতে পৌঁছে গিয়েছিলাম। পঞ্চাশ ষাট ও সত্তর দশকের বহু কাব্যগ্রন্থ গল্প উপন্যাস এবং আরও নানারকমের বাংলা বই ঘরের এককোণে আলাদাভাবে দাঁড় করিয়ে রাখা ছিল।

সেখান থেকে বেছে আনা কিছু বই এখনো আমার কাছে রয়েছে। সেগুলোর কোনো-কোনোটায় থেকে গেছে প্রণবদার হাতের লেখা। কিছু-কিছু সংশোধন, তথ্যের সত্যতা নিয়ে সংশয় বোঝাতে কিছু প্রশ্নচিহ্ন, বিশেষ কারণে কোনো একটি লাইনের নীচে একটি দাগ, ইত্যাদি। এ সবই উনি করেছিলেন বইটি খুব মন দিয়ে পড়তে-পড়তে। হয়তো কিছুটা নিজের অজান্তেই। ওই সব সংশোধন, চিহ্ন আর দাগগুলোর আজ আর কোনো দরকার নেই। ওগুলো বইয়ের পাতায় প্রণবদার স্মৃতিচিহ্ন হিসাবেই থেকে যাবে।

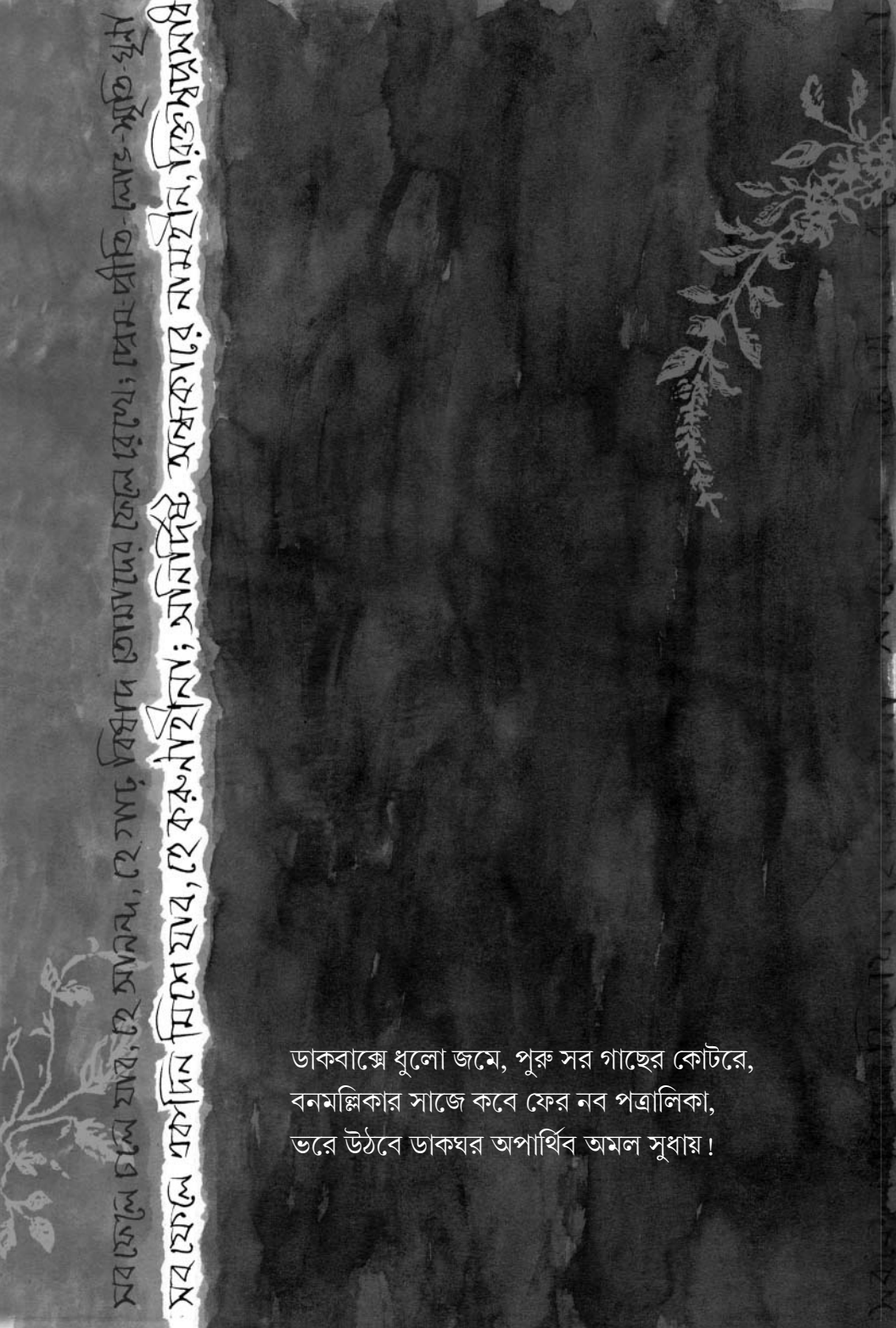

ডাকবাক্সে ধুলো জমে, পুরু সর গাছের কোটরে,
বনমল্লিকার সাজে কবে ফের নব পত্রালিকা,
ভরে উঠবে ডাকঘর অপার্থিব অমল সুধায়!

জাদুকর পি. সি. সরকার (জুনিয়ার)-এর সঙ্গে প্রণবকুমার

প্রণবদার জাদুপ্রীতি

দীপক রায়চৌধুরী

১৯৭৮ সাল। কলকাতা থেকে একদল জাদুকর চলেছেন জব্বলপুর। উদ্দেশ্য জাদুকর রমেশ ও আনন্দ আয়োজিত জাদু-সম্মেলনে অংশ গ্রহণ। দলে রয়েছেন জাদুকর ফ্র্যাংক (দীপ্তেন বিশ্বাস), পিটার প্যান, শৈলেশ্বর প্রমুখ জাদুকর এবং বিখ্যাত জাদু-সরঞ্জাম প্রস্তুতকারক শংকর দাস। আর মধ্যমণি হিসেবে রয়েছেন কবি প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়। উনি যাচ্ছেন জাদু প্রতিযোগিতার অন্যতম আমন্ত্রিত বিচারক হয়ে। ইতিমধ্যে

প্রণবদা বাংলার একজন গণ্যমান্য জাদু-সমালোচক হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছেন। জাদুপ্রীতি তাঁকে বাধ্য করেছিল জাদু-সাহিত্যে মনোনিবেশ করতে এবং গভীরভাবে তা নিয়ে পড়াশোনা করতে। প্রণবদা নিজে একসময় নানারকম তাসের ম্যাজিক দেখাতেন। অঙ্কের ধাঁধার মতো যেসব ম্যাজিক, তা ওঁর খুবই পছন্দের ছিল। খুব বলতেন প্রবাদপ্রতিম আমেরিকান ম্যাজিশিয়ান জন স্কার্নের কথা। একসময় ওঁর জাদু সংক্রান্ত বইয়ের সংগ্রহও ছিল ঈর্ষণীয়।

ক্রমশ প্রণবদার বাড়িটি হয়ে উঠেছিল জাদুচর্চার একটি প্রাণকেন্দ্র। বাংলার জাদুকরদের নিয়মিত আনাগোনা ছিল তাঁর বাড়িতে। কে আসত না সেখানে? জাদুকর সমীরণ, গৌতম গুহ, সুনীপ সাহা, রাজ কোঠারি, ডি. লাল, অমর সেন, সব্যসাচী সেন, প্রিন্স শীল, বিক্রমাদিত্য, এম. এন. মুখার্জি, ম্যাজিকপ্রিন্স এস. লাল, রাজকুমার, দীপক রায়, সুনীল কর্মকার, তাপস বসু, সূরজ, তরুণতম অ্যামেজিং ডেভিড—কে নয়! আমি নিজেও তো কোনো নতুন ম্যাজিক তৈরি করলে মনে-মনে ভাবতাম, কবে প্রণবদাকে গিয়ে সেটা দেখিয়ে আসব! আসলে ম্যাজিকের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা প্রতিটি মানুষকেই প্রণবদা নিজের আত্মজন বলে মনে করতেন। তাদের সুখ-দুঃখের খবর নিতেন। কারো খোঁজ একটু বেশিদিন না-পাওয়া গেলে, আমাদের মতো যাদের সঙ্গে তাঁর নিয়মিত যোগাযোগ ছিল, তাদের কাছে তার খবর জিগ্যেস করতেন। তবে, প্রণবদার অত্যন্ত প্রিয় জাদুকর, যাদের প্রশংসায় তিনি পঞ্চমুখ, তাদের মধ্যে জাদুকর রাজ কোঠারি আর ডি. লাল সবার আগে। রাজ কোঠারির হাতের 'কয়েন থ্রু টেবিল'

(একটি ধাতুর মুদ্রা, কাঠের টেবিল ভেদ করে নীচে পড়ে যাচ্ছে) আর ডি. লালের হাতের 'কাপস অ্যান্ড বলস্' (তিনটি ধাতব কাপের মধ্যে এক বা একাধিক বল স্থান পরিবর্তন করছে, কখনো ভ্যানিশও হয়ে যাচ্ছে) প্রণবদার বর্ণনায় আমাদের কাছে মূর্ত হয়ে উঠত। পরের দিকে খুব প্রিয় ছিল জাদুকর সুনীল কর্মকারের হাত-সাফাই এবং তাসের খেলা।

একসময় প্রণবদা তাঁর প্রিয় কবি-লেখকদের নিয়ে যখন আড্ডার আসর বসাতেন, তখন তাতে অনিবার্যভাবে ম্যাজিকও থাকত। আর থাকত খাওয়াদাওয়া। আন্দাজ বছর দুয়েক আগে ম্যাজিশিয়ান সুনীল কর্মকার যেদিন প্রণবদার বাড়ি ম্যাজিক দেখাল, সেদিনও নয়-নয় করে ওঁর জনা বিশ-পঁচিশজন আত্মীয়-বন্ধু তো এসেই ছিল। ম্যাজিক শেষে সবার জন্যে ছিল মিষ্টি আর তাঁর পুত্রবৎ-বন্ধু, যে তাঁকে সর্বক্ষণ আগলে-আগলে রাখত, সেই সুব্রত গুহ-র হাতের অপূর্ব কাতলামাছের চপ। মনে আছে আর একবার বর্ষায় ওঁর বাড়িতে নেমন্তন্ন ছিল ইলিশমাছ আর খিচুড়ি খাওয়ার। সেদিন আমার আর সুনীল কর্মকারের সঙ্গে নিমন্ত্রিত ছিল স্নেহভাজন কবি রজতেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ক্লোজ-আপ ম্যাজিকের আসর শেষ হলে, সুব্রতর হাতের দারুণ খিচুড়ির সঙ্গে তিন-চারপিস করে গরম-গরম ইলিশমাছ ভাজা খাইয়েও প্রণবদার যেন আশ মিটছিল না। বারবার দুঃখ করছিলেন, যোধপুরপার্ক বাজারে চেনা মাছবিক্রেতা নিমাইয়ের কাছে আরও একটু বড়ো মাপের ইলিশ পাওয়া যায়নি বলে। অমন খাদ্যরসিক মানুষ এখন তো বড়ো একটা দেখি না। একবার ওঁর বাড়িতে খিচুড়ি দিয়ে পাঁঠার মাংস খাচ্ছি। আর উনি পাশে বসে খেতে

খেতে আমায় বলছেন, 'আহ, দীপক! মাংসর ঝোলটা একটু খিচুড়ির মধ্যে মেখে খাও! তবে তো স্বাদ পাবে!!'

কতবার যে ওঁর বাড়িতে খেয়েছি তার কোনো হিসেব নেই। মোটামুটি আটের দশকের শুরুর দিকে প্রণবদা এই খাওয়াদাওয়া নিয়ে আমাদের একটা গ্রুপ তৈরি করেছিলেন। এতে ছিলেন প্রণবদা নিজে, ওঁর বোন খুকুদি, ওঁর এক ভায়রাভাই কেষ্টদা, জাদুকরদের মধ্যে সুনীপদা, তাপস আর আমি। সেই গ্রুপে ঠিক হয়েছিল এক-একবার এক-একজনের বাড়িতে নেমন্তন্ন করে সবাইকে সপরিবার খাওয়াতে হবে। এখন তার জন্যে তো একটা উপলক্ষ্য চাই। উপলক্ষ্য কী—না যে যার বিবাহবার্ষিকীতে আমন্ত্রণ জানাতে হবে। এবং শুধু তাই না, আমাদের মধ্যে একমাত্র সুনীপদা, যে বিয়ে করেনি, তাকে প্রণবদা বলেছিলেন, "তাহলে তোমার জন্মদিন হোক অথবা তোমার খুশিমতো একটা উপলক্ষ্য তুমি বানিয়ে নাও! কিন্তু আমাদের নেমন্তন্ন করতেই হবে! পালালে চলবে না!" এই একটা ব্যাপার ছিল দারুণ ইন্টারেস্টিং। সবাই মিলে হইহই করতে করতে সবার বাড়ি যাওয়া-টাওয়া হত। আমার মনে আছে প্রণবদার মেয়ে টুপুর, শ্রাবণীবউদি, তাপসের ছেলে-মেয়ে-বউ, আমার ছেলে-মেয়ে-গিন্নি আর সুনীপদা মিলে সাতাশি-অষ্টাশি সাল নাগাদ বেড়াতে গিয়েছিলাম সাগরদ্বীপে। সেখানে যে-হোটেলটা আমরা বুক করেছিলাম দেখলাম সেখানে জল নেই। পাম্প খারাপ হয়ে পড়ে আছে। তখন প্রণবদা বললেন, "বকখালিতে চলো!" সেখান থেকে আমরা আবার ছুটলাম বকখালি। সব মিলিয়ে কিন্তু খুব মজা হয়েছিল।

প্রণবদার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল একদম পারিবারিক। আমার ছেলে যখন মাত্র সাত বছর বয়সে চলে গেল ১৯৮৯ সালে তখন প্রণবদা খুব আঘাত পেয়েছিলেন। এরপরে আচমকা চলে গেল ওঁর মেয়ে টুপুর। সেই ধাক্কাটাও ছিল সহ্যের বাইরে। ওই একই ধরনের দু-টো ধাক্কা বোধহয় অবচেতনে আমাদের আরও কাছাকাছি এনে দাঁড় করিয়েছিল। এর কিছুদিন পরে তো বউদিও চলে গেলেন। প্রণবদা হয়ে গিয়েছিলেন নিঃসঙ্গ এবং একা। নানা বৃত্তের বন্ধুদের তখন উনি যেন আরও বেশি করে আঁকড়ে ধরতে চাইতেন আত্মীয়-স্নেহে।

একসময় প্রণবদা 'দেশ' পত্রিকায় বিভিন্ন জাদুর অনুষ্ঠানের সমালোচনা লিখতেন। সেসময় আর কেউ সেটা করতেন বলে আমার মনে পড়ে না। পরেও দেখেছি বলে তেমন স্মৃতি নেই। জাদু যে একটি উন্নতমানের শিল্প এবং জাদুর অনুষ্ঠানের সমালোচনাও যে গান, নাটক বা সাহিত্য অনুষ্ঠানের মতোই একটি মান্য সাহিত্য পত্রিকায় এসবের পাশাপাশি স্থান পাওয়ার যোগ্য—এটা প্রণবদা তাঁর জাদুপ্রীতির কারণেই প্রমাণ করতে পেরেছিলেন। এই সময় থেকেই উনি শুরু করেন জাদু বিষয়ে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লেখালিখি। দীপক রায় সম্পাদিত 'জাদুকর' পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন তিনি। অনেক আগে *বুদ্ধির্যস্য* নামে একটি অসাধারণ ধাঁধার বই লিখছিলেন প্রণবদা, যা এখন দুষ্প্রাপ্য। আনন্দমেলার 'সত্যসন্ধ' আর তথ্যকেন্দ্রের 'মজারু' যে আমাদেরই প্রিয় প্রণবদা, তা আজ অনেকেরই জানা। 'একদিন' পত্রিকার শারদসংখ্যা 'নবপত্রিকা' ২০১০-এ ওঁর দেখা জাদুকরদের নিয়ে একটি অসাধারণ রচনা লিখেছিলেন।

নাম দিয়েছিলেন, 'ম্যাজিক! ম্যাজিক!'। পরে ওই পত্রিকাতেই ২০১২ সালের শারদীয়া সংখ্যায় লিখেছিলেন আরেকটি জরুরি লেখা 'বাঙালির সার্কাস'। ফেব্রুয়ারি ২০১৭-তে 'লিপিনাগরিক' পত্রিকার 'সংগ্রাহক' সংখ্যায় প্রণবদা লিখেছিলেন তিন জাদু-সংগ্রাহককে নিয়ে: পূর্ণচন্দ্র মেহরা (পি.সি. মেহরা), বিশ্বেশ্বর দাস (বি. দাস) এবং শৈলেশ্বর মুখোপাধ্যায়। এঁদের মধ্যে প্রথম দুজনের সম্পর্কে নানা তথ্য এবং ছবি জোগাড় করতে ওঁকে ওই বয়সেও কী পরিমাণ সক্রিয় হতে হয়েছিল, তার সাক্ষী আমি নিজে। এর মধ্যে পুরুলিয়ার বি. দাসকে আমি নিজেও চোখে দেখিনি। কিন্তু সেই মানুষটির কৃতিত্বকে সবার চোখের সামনে তুলে ধরবার জন্যে তাঁর যে প্রচেষ্টা, তা ছিল তুলনাহীন। একটি তথ্য, তা যত তুচ্ছই হোক না কেন, তাকে পুরোপুরি যাচাই না করে লিখে দেওয়ার কোনো নজির আর যারই থাক না কেন, প্রণবদার অন্তত ছিল না।

জাদুজগৎ বিভিন্ন ভাবে তাঁর অবদান ভুলবে না। তাপস বসুকে 'আনন্দমেলায়' আর ম্যাজিক প্রিন্স এস. লাল কে 'তথ্যকেন্দ্র' পত্রিকায় নিয়মিত ম্যাজিক শেখানোর জন্য উনিই যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিলেন।

আজও প্রিন্স শীল তার বিখ্যাত 'বুলেট ক্যাচিং' (বন্দুকের বুলেট সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে নিজের দাঁতে করে কামড়ে ধরা) ম্যাজিকটির জনপ্রিয়তার জন্য প্রণবদার ভূমিকার কথা সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করে।

প্রণবদার কাছে আমারও ঋণের শেষ নেই। জাদুর সঙ্গে আমার একটু-আধটু গল্প লেখার বদ-অভ্যেস আছে। সেগুলো

নানান পত্রপত্রিকায় বেরলেও তাদের নিয়ে বই করার কোনো পরিকল্পনাই আমার ছিল না। এটা ঘটেছিল আমার নিজেরই ছোটোভাইয়ের উৎসাহে। ঠিক হয়েছিল, একই মলাটে প্রকাশিত হবে দু-টি গল্পের বই—*দাগ*, *ডবল পেমেন্ট*। বইটির একটি ভূমিকা লিখে দেওয়ার অনুরোধ নিয়ে আমি প্রণবদার কাছে গিয়েছিলাম খুবই কুণ্ঠিতভাবে। উনি আনন্দের সঙ্গে তা লিখে দিয়েছিলেন। আমাকে যে উনি কতটা ভালোবাসতেন তার নমুনা ধরা রয়েছে ওই অসামান্য ভূমিকায়। তারপর ২০১৬-র ১৩ অগস্ট প্রবল বৃষ্টি উপেক্ষা করে আমাদের ছোট্ট অনুষ্ঠানটিতে এসে ওই বইটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশও করেছিলেন নিজের হাতে। আর যা বক্তব্য রেখেছিলেন, তা-তে একজন জাদুকরের গল্পের বই বেরিয়েছে—এটা তাঁর কাছে যে খুবই আনন্দের একটা ব্যাপার, সেটা পরিষ্কার ফুটে উঠেছিল।

'ফেডারেশন অভ ইন্ডিয়ান ম্যাজিক অ্যাসোসিয়েটস' (ফিমা)-এর জন্মলগ্ন থেকে প্রণবদা অভিভাবকের ভূমিকা পালন করে এসেছেন। তাঁকে ছাড়া ফিমা-র 'ম্যাজিক মেলা' ভাবাই যায় না। মনে আছে ম্যাজিক মেলা দুপুর দু-টোয় শুরু হত বলে, উনি দুপুরের রোদ উপেক্ষা করে রবীন্দ্রসদন প্রাঙ্গণে হাজির হয়ে যেতেন, সেইসময় খোলা-মাঠে মাদারিদের খেলা চাক্ষুস উপভোগ করার জন্য।

জাদু সমালোচনায় তিনি অত্যন্ত নিরপেক্ষ ছিলেন। প্রয়োজনে রূঢ়ভাবে সমালোচনা করতেও দ্বিধা করতেন না। সব জাদুকরের হাতে একই ধরনের ম্যাজিক দেখে-দেখে বীতশ্রদ্ধ হয়ে, তিনি 'জাদুকর' পত্রিকার পাতায় লিখেছিলেন, "কেন

তোমাদের একজনের খেলা দেখলেই সবার খেলা দেখা হয়ে গেল বলে আমাদের মনে হয়?”

এই মোক্ষম প্রশ্নটিই যেন বাংলার জাদুকরদের উদ্দেশে প্রণবদার শেষ সতর্কবাণী।

প্রণবদার এই লাস্ট ওয়ার্নিং যদি আজকের জাদুকররা মনে প্রাণে গ্রহণ করে ও কাজে লাগায়, তা হলে বাংলার জাদু অভিনবত্বে ও বৈচিত্র্যে নিশ্চয়ই আবার শ্রেষ্ঠত্বের আসন অর্জন করবে।

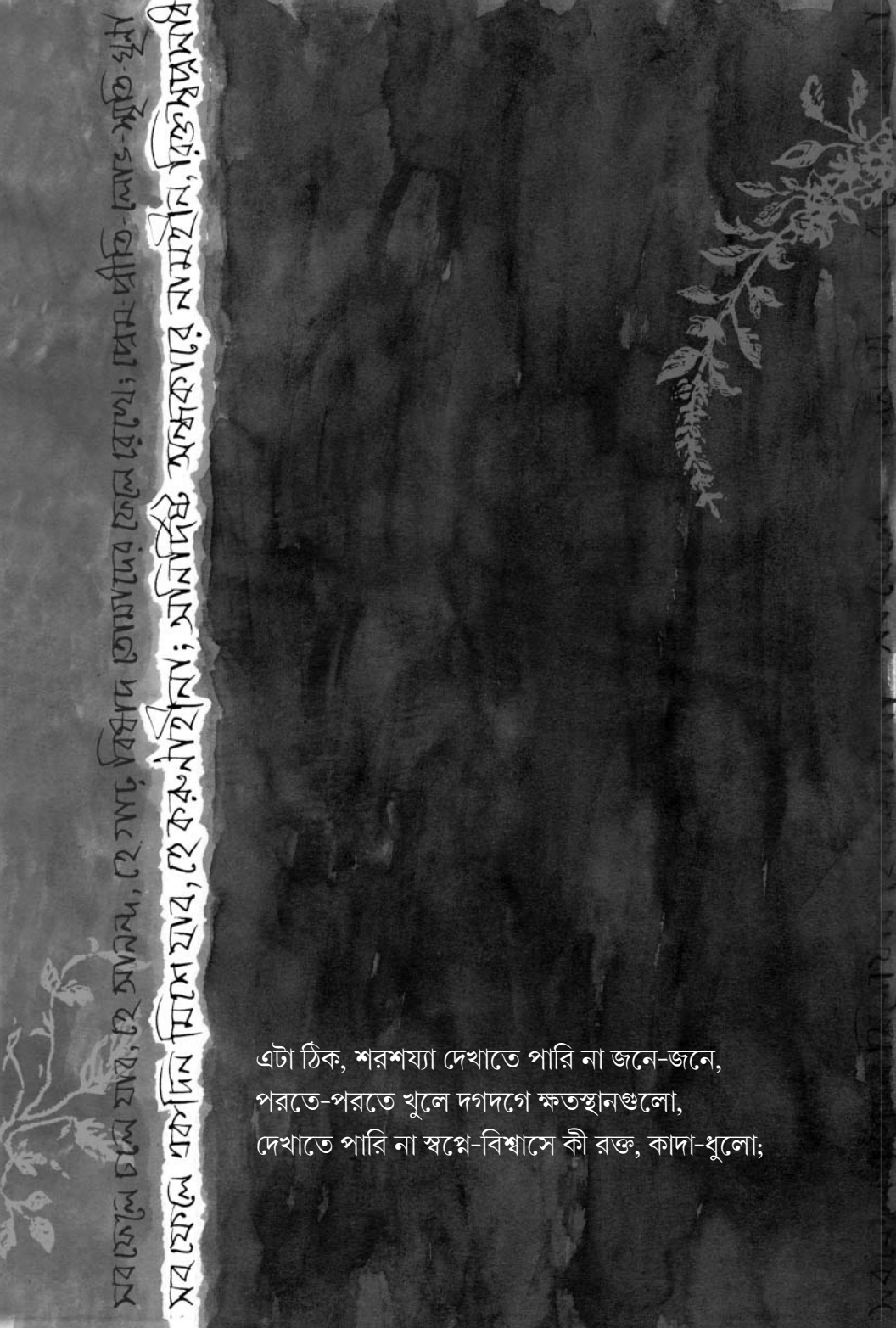

এটা ঠিক, শরশয্যা দেখাতে পারি না জনে-জনে,
পরতে-পরতে খুলে দগদগে ক্ষতস্থানগুলো,
দেখাতে পারি না স্বপ্নে-বিশ্বাসে কী রক্ত, কাদা-ধুলো;

অর্ঘ্য সেনের সঙ্গে প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

কবিতা, আমি ও প্রণবকুমার

রজতেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়ের কবিতা পড়ার বহু আগে থেকে পড়ছি তাঁর ‘ধাঁধা’ আর ‘মজার খেলা’ ধারাবাহিক দু-টি। পড়েছি ছোটোবেলায়। প্রিয় পত্রিকা ‘আনন্দমেলা’র পাতায়। কিন্তু ওই লেখা দু-টি উনি লিখতেন ‘সত্যসন্ধ’ এবং ‘মজারু’ ছদ্মনামে। প্রণবদার লেখা কবিতার বই পড়ার বহু আগে থেকেই ওঁর কবিতা পড়ছি ‘দেশ’ পত্রিকায়। সাধারণ এবং শারদীয়— দু-ধরনের সংখ্যাতেই কবিতা বিভাগে। তখন আন্দাজই ছিল না,

এই কবি ভদ্রলোকই এতদিন আমাদের ধাঁধা আর মজার খেলা শিখিয়ে আনন্দ দিয়ে এসেছেন। তারপর হঠাৎ একদিন লক্ষ করলাম 'দেশ' পত্রিকায় আর তাঁর কবিতা প্রকাশিত হচ্ছে না। ভাবতাম, তিনি কি কবিতা লেখা ছেড়েই দিলেন নাকি? এর মধ্যে রবীন্দ্রসদনের মঞ্চে ওঁকে কবিতা পড়তে দেখেছি দু-একবার। তাই চেহারাটা চেনা ছিল। ম্যাজিক আমার চিরকালের প্রিয়। 'ফিমা' (ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান ম্যাজিক অ্যাসোসিয়েটস)- র 'ম্যাজিকমেলা' প্রথম হয়েছিল রবীন্দ্রসদন প্রাঙ্গণে, ফেব্রুয়ারি ২০০৯-এ। সেখানে আমার তরুণতম জাদুকর বন্ধু অ্যামিজেং ডেভিড এক আশ্চর্য এস্কেপের খেলা দেখাবে বলে আমায় সপরিবার আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। সেখানে গিয়ে দেখি প্রণবদা গোটা মেলা জুড়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন। কলকাতার সিনিয়র ম্যাজেশিয়ানদের সঙ্গে গম্ভীর হয়ে কথাবার্তা বলছেন। তাহলে কি কোনো কাগজের হয়ে এসেছেন ইভেন্টটা কাভার করতে? কিছুক্ষণ পরেই বুঝলাম কবিতার মতো ম্যাজিকের জগতেও তিনি খুবই পরিচিত একটি নাম।

কিছুদিন ধরে সিনিয়র পি. সি. সরকার এর কিছু ম্যাজিক নিয়ে আমি কিছু কবিতা লেখার চেষ্টা করেছিলাম। যেগুলো নিয়ে একটা একফর্মার বইও বেরিয়েছিল সেইসময়। বইটা সেদিন আমার কাঁধঝোলাতেই ছিল। খুব কাছের বন্ধু ছাড়া, নিজের বই অন্য কারোর হাতে তুলে দিতে বড়ো কুণ্ঠা লাগে। তাই বিষয়টা যতদূর সম্ভব এড়িয়েই চলি। কিন্তু এমন একজন মানুষ তো আমি চাইলেই আর পাব না, যাঁর কবিতা ও ম্যাজিক দু-টোতেই সমান আগ্রহ রয়েছে। খুব তাড়াহুড়ো করে মাঠের একধারে গিয়ে,

বইটার প্রথম পাতায় ঝরনাকলমে প্রণবদার নাম লিখে, সে-টা কাছে গিয়ে ওঁর হাতে কোনোমতে তুলে দিয়েছিলাম। উনি হাতে নিয়ে একটুও না-হেসে বলেছিলেন— "ধন্যবাদ ভাই। পরে পড়ে জানাব।"

এরপর চার-পাঁচদিন কেটে গেছে। হঠাৎ এক সকালবেলায় আমার ল্যান্ডলাইনে একটা ফোন এল। তুলে দেখি প্রণবদা। কিন্তু আমার নম্বর কোথায় পেলেন? বইতে তো আমার কোনো ফোন নম্বর দেওয়া ছিল না। সেই কথাটা ওঁকে জিগ্যেস করার আগেই যেটা শুনলাম, সেটাতেই আমার আক্কেল গুড়ুম! উনি খুব ঠান্ডা গলায় জানালেন, আমি নাকি ভুল করে অন্যের বই ওঁকে দিয়ে ফেলেছি। কারণ যে-বইটি আমি ওঁকে দিয়েছি, তার প্রথম পাতায় আমি নাকি লিখেছি 'প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায় মান্যবরেষু'। উনি মোটেও সেই মানুষ নন। উনি এটাও বললেন, বইটা যা-তে তার আসল প্রাপকের হাতে পৌঁছয়, সেটা উনিই দেখবেন। তবে, কবিতাগুলোর ওপর উনি একঝলক (এই শব্দটা এখনও কানে বাজে) চোখ বুলিয়েছেন। সেগুলো ওঁর একটু অন্যরকম লেগেছে। ব্যস, এইটুকুই।

উনি ফোন কেটে দেওয়ার পরে রিসিভার হাতে কয়েক সেকেন্ড চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলাম। তাড়াহুড়োয় সেদিন এত বড়ো একটা ভুল করে ফেলেছি—খেয়ালই করিনি। সাফাই গাইবার কোনো সুযোগও উনি আমায় দ্যাননি। এরপর বেশ কয়েক মাসের নীরবতা। তারপর 'একদিন' কাগজের 'নবপত্রিকা'য় বেরনো ওঁর একটা কবিতা পড়ে ফোন করেছিলাম। নম্বর পেয়েছিলাম *সাহিত্যের ইয়ারবুক* থেকে। নিজেই ধরলেন। প্রথমেই জিগ্যেস

করেছিলেন, তাঁর নম্বর আমি কোথায় পেলাম। আমি উত্তরটা দিতেই বলেছিলেন, আমার ফোন নম্বরও ওঁর সেখান থেকেই পাওয়া। সেদিন কিন্তু উনি বেশ সহজভাবেই কথা বলেছিলেন। আমি মিনমিন করে বলেছিলাম, কবি প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়কে সত্যিই আমি চিনি না। তাড়াহুড়োয় ভুল পদবি লিখেছিলাম। শুনে একটু যেন পজ পড়ল। তারপর হেসে বলেছিলেন, "ও বইটা তো আমি প্রণব চাটুজ্জের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি!" তারপর বাড়িতে আসতে বলে বলেছিলেন, "তুমি যেদিন আসবে, ওটার আরেকটা কপি এনো তো আমার জন্যে!"

সেই থেকে যাতায়াতের শুরু। মন দিয়ে পড়া শুরু প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়ের কবিতা। যে-বইগুলো তখন আর পাওয়া যায় না, যেমন *অতলান্ত*, *এসো, হাত ধরো*—সেগুলো হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখেছি। কখনো বা বাড়িতে এনে পড়ে, আবার ফেরত দিয়ে এসেছি। খুব অবাক হয়েছি *অপেক্ষার রঙ* বা *জল তবু দগ্ধ করা*-র মতো বইয়ের নামপত্র দেখে। কারণ অপেক্ষারও যে একটা 'রঙ' হতে পারে বা জলও যে একজন মানুষকে দগ্ধ করতে পারে, সেটা উনি দেখার আগে কেউ হয়তো সেভাবে লক্ষই করেনি। শেষের দিকের কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ উনি উপহারও দিয়েছিলেন আমায়। প্রথম পাতায় ওঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে লিখে, শিল্পীত হস্তাক্ষরে। তারপর আস্তে-আস্তে ওঁর *কাব্যসমগ্র*-এর কাজ শুরু হল। কাছের বন্ধুরা অগ্রন্থিত কবিতাগুলি খুঁজেপেতে জোগাড় করে দিতে লাগলেন নানান পত্রপত্রিকা থেকে। সেগুলো বাছাই করে, কেটে-কেটে, সাদা পাতায় আঠা দিয়ে আটকে পাণ্ডুলিপি তৈরির কাজ চলল। আমি মাঝে-মাঝে তার থেকে

দু-একটা পাতা টেনে নিয়ে তা-তে সাঁটা কবিতাও পড়েছি। ডবল করে করা ফোটোকপি বাড়ি নিয়ে এসেছি ঝোলায় ভরে। এবং আমার আনন্দ, যিনি একসময় অজস্র বইয়ের অসামান্য সব ব্লার্ব লিখেছেন, তাঁর কাব্যসমগ্রের জ্যাকেটের ভেতরের দুটি ব্লার্ব—বইটির বিষয়ে এবং কবির বিষয়ে, লেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।

তবে, পঁয়ষট্টি বছরেরও বেশি সময় ধরে লিখে চলা প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়ের কবিতা পড়ে, আমি কিন্তু কখনো খুব চমকে উঠেছি বলে মনে পড়ে না। তাঁর কবিতা পড়ে রাত জেগেছি একলা নিস্তব্ধ ছাদে কিংবা অস্বস্তির মধ্যে কাটিয়েছি কয়েকটা দিন—এমন স্মৃতিও বড়ো একটা নেই। তিনি যে খুব মারকাটারি কবিতা লিখতেন—এমনটাও আমার মনে হয়নি কখনো। কিন্তু স্বীকার না-করে উপায় নেই, পড়বার পর, তাঁর কবিতা, কিংবা বলা ভালো, কবিতার কিছু পংক্তি, বাক্য বা শব্দ আমার সঙ্গে থাকত অনেকটা সময়। একটা নিবিড় স্নিগ্ধতা, আচ্ছন্নতা বা স্মৃতিমেদুরতার ছায়া ঘিরে থাকত যেন আমায়। যার কিছুটা প্রত্যক্ষ হলেও বেশিটাই কিন্তু প্রচ্ছন্নভাবে। জীবনে অসহনীয় কিছু ধাক্কা খেয়েছেন বলেই হয়তো মৃত্যুচেতনার এক ঠান্ডা ভিজে স্রোত, হৃদয় থেকে নিঃসৃত হয়ে ঘিরে ফেলত তাঁর বেশিরভাগ কবিতাকে। থেকে-থেকে জোলো হাওয়ার মতো সেটাই যেন শিরশিরিয়ে দিত।

তাঁর কবিতায় ছড়িয়ে থাকা অভিনবত্বের কিছু টুকরো-টুকরো আঁচড়কে চিহ্নিত করার জন্যে আমি এখানে তাঁর শেষ কাব্যগ্রন্থ *কেমন আছে এই পৃথিবী*-কে বেছে নিলাম। এই বইটি বেরিয়েছিল

জানুয়ারি ২০১৫-য়। প্রথমে, এর থেকে যে-কবিতাটির কথা বলব, তার নাম 'ছায়াপাখি'। আপাতভাবে এটি একটি স্নিগ্ধ রোম্যান্টিক কবিতা। কিন্তু যার একেবারে শেষ লাইনের শেষ বাক্যটি হল—'ছটফটাচ্ছে ছায়ার পাখি'। যে-পাখির শরীর ছায়া দিয়েই তৈরি সে ডানা ঝাপটে ছটফটায় কেমন করে! আর এই ছটফটানিটা চোখে পড়েছিল শুধুই কবির—আর কারো নয়। এখানে বলে রাখা ভালো 'ছায়া' শব্দটিকে প্রণবদা বিভিন্ন কবিতায় নানাভাবে ব্যবহার করেছেন। মৃত্যুর মতো ছায়াও হয়তো ছিল তাঁর একটি প্রিয় অনুষঙ্গ।

'শরশয্যা' এর পরের একটি কবিতা। সেখানে তিনি নিজের জীবনযাপনকে ভীষ্মের শরশয্যার সঙ্গে তুলনা করেছেন। শোকের অজস্র শর শরীরে বিঁধলেও এখনও তাঁর জীবন শেষ হয়ে যায়নি। কাছের মানুষদের আচরণ তাঁকে বিদীর্ণ করেছে বারেবারে। তবু হৃদয়ের সমস্ত ক্ষত নিয়ে তিনি মৃত্যুর সঙ্গে নিয়ত কানামাছি খেলে যাচ্ছেন। অথচ কেউ তাঁর সেই ক্ষত দেখতে পাচ্ছে না।

এটা ঠিক, শরশয্যা দেখাতে পারি না জনে-জনে,
পরতে-পরতে খুলে দগদগে ক্ষতস্থানগুলো,
দেখাতে পারি না স্বপ্নে-বিশ্বাসে কী রক্ত, কাদা-ধুলো;

নিজের এই শরবিদ্ধ অবস্থাটিকে প্রকৃতির একটি ফুলের উপমার মধ্যে দিয়েও তুলে ধরেছেন তিনি, একটু ঘুরিয়ে, যা আমার চোখে খুবই নতুন। ফুলটি আমাদের অতি পরিচিত—কদম। কবিতার নামপত্রও সেটাই। যদিও চেনা গাছ, চেনা ফুল—এসবের উল্লেখ তাঁর অনেক কবিতাতেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসেছে।

কাঁটার কেশরে ঢাকা সর্বাঙ্গ, দেখি যে, অন্যমনে
কখন চোখের সামনে ফুটে আছে আমার কদম!

এই কবিতায়, তার শরীরে বিঁধে-থাকা শরগুলি রূপবদলের ফলে কেবল কদমফুলের কাঁটা হয়ে গেছে। এ হল সেই কদমফুল, যাকে বর্ষার স্নিগ্ধতা এবং চিরন্তন প্রমের পরিবেশ বোনার জন্যে বাংলার কাব্যসংসারে বারবার টেনে আনা হয়েছে। আর এখানেই কবি প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়ের অভিনবত্ব।

তাঁর কাব্যসমগ্রের অগ্রন্থিত সংগ্রহে 'তূণীর' নামে একটি কবিতা আছে। যার বিষয়ের সঙ্গে 'শরশয্যা' কবিতাটির ভাব অনেকটাই মিলে যায়। শুধু এখানে অজস্র মন্ত্রপূত বাণে-ভরা অর্জুনের তূণীরটিকে কবি, রবীন্দ্রনাথের *গীতবিতান*-এর সঙ্গে তুলনা করেছেন। কারণ অর্জুনের একেকটি শর যেমন ভীষ্মকে দিব্য পানীয়জল এবং মাথার উপাধান অর্থাৎ বালিশ জুগিয়ে শান্তি দিয়েছিল, *গীতবিতান*-এর মধ্যে থাকা একেকটি গানও তাঁকে সেইরকমই শান্তি জুগিয়ে থাকে স্মৃতিপীড়িত রক্তাক্ত দিনে।

আজ সেই বীর
ভরে রেখেছেন পুণ্য শরে তাঁর আশ্চর্য তূণীর—

ডাকনামে যা, গীতবিতান।

বস্তুত, রবীন্দ্রনাথের গান একজন মানুষের কতবড়ো আশ্রয় হলে, তবে তিনি এমন একটি পংক্তি লিখতে পারেন। *গীতবিতান* বইটিকে তিনি যে কতবার কতরকমভাবে দেখেছেন তা বলার নয়। তাঁর এই কাব্যগ্রন্থে 'গীতবিতান' নামেও একটি কবিতা আছে। যার মাঝখানেও উনি নিজের বেঁচে থাকাটাকে ভীষ্মের

শরশয্যার সঙ্গে তুলনা করেছেন। আর এর শেষ কয়েকটি পংক্তি হল—

কীর্তি বোঝাই সেই-যে নৌকো
আমি শুধু বেছে নিয়েছি চৌকো
সোনার ধান:
প্রতি তারে বাঁধা জীবনের বোধ,
ঘাতে-প্রতিঘাতে বাঁচার রসদ
গীতবিতান।

আর রবীন্দ্রনাথ তো প্রণবদার বিভিন্ন কবিতার নামপত্রে ও কবিতার শরীরে ছড়িয়ে রয়েছেন। যেমন এই বইটির কয়েকটির কবিতার নাম 'ঋতুরঙ্গ', 'ছায়াপাখি', 'গীতবিতান', 'কাঙাল করেছ', 'রূপান্তর', 'তুমি রবে নীরবে', 'যাওয়া তো নয় যাওয়া', 'দাহনবেলা'।

এই বইটির শুরুর দিকে একটি কবিতার নাম—'ও প্রযুক্তি, ও একুশ শতক'। টানা গদ্যে প্রণবদা খুব বেশি কবিতা লেখেননি কিন্তু এটি একদম রান-অনেই লেখা। কবিতাটি শুরু হচ্ছে এইভাবে,

ও ডোরবেল, আর ডিংডং নয়। এবার থেকে বেজে ওঠো অর্ঘ্য সেনের গলায়। বলে ওঠো, 'খোলো খোলো দ্বার।

কবির একান্ত ইচ্ছে—এই প্রযুক্তি-চিৎকৃত সময়ে আমাদের নিত্তদিনের ব্যবহার্য প্রতিটি যন্ত্র ও তার কলকব্জার মধ্যে প্রথিত হোক রবীন্দ্রনাথের গান। যন্ত্রের নিজস্ব যান্ত্রিক শব্দের বদলে, কবির প্রিয় গায়ক-গায়িকাদের গাওয়া গীতবিতানের গানগুলি যেন তার মধ্যে থেকে বেজে ওঠে সুললিত হয়ে। যা শুনে

তাঁর অন্তর তৃপ্তি পাবে। এই চাওয়াটার মধ্যেও কিন্তু একটা অভিনবত্ব আছে। যেমন আছে, কোনো বিশেষ যন্ত্র বা কলকব্জা, কোন্ শিল্পীর কণ্ঠে কোন্ গানটি গেয়ে উঠতে পারে—সেই কল্পনাটির মধ্যেও।

রবীন্দ্রনাথের গানের প্রতি নিজের এই অকৃত্রিম ভালোবাসার কথা সারাজীবন ধরে শুধু লিখেই থেমে থাকেননি প্রণবদা, নিজের জীবনের শেষ ক-টা দিনে খাতায় কলমে প্রমাণও করেছিলেন। শেষবার নার্সিংহোমের সবিশেষ পরিষেবাযুক্ত কক্ষে, সারা শরীরে নল এবং ছুঁচ-ফোঁড়া অবস্থায় যখন তাঁর অবর্ণনীয় কষ্ট—শরীরের ভেতরের সমস্ত কলকব্জাগুলি যখন হাল ছেড়ে দিয়েছে—তখন পুত্রসম বন্ধু সুব্রত গুহকে তিনি জড়ানো গলায় অনুরোধ করেছিলেন তাঁকে রবীন্দ্রসংগীত শোনাবার জন্যে। শেষ ইচ্ছে অনুযায়ী যখন তাঁকে সমস্ত চিকিৎসা-পরিষেবা সমেত সুব্রতদা যোধপুর পার্কের বাড়িতে নিয়ে এল, তখন প্রণবদা খাওয়াদাওয়া প্রায় বন্ধ করে দিয়েছেন এবং কাউকে চিনতে পারছেন না। অথচ তাঁর কানের কাছে যখন মোবাইল ফোনে পরপর রবীন্দ্রসংগীত চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে তখন দেখা যাচ্ছে তিনি বিড়বিড় করে সেই গানটির বাণী অবচেতনে উচ্চারণ করে চলেছেন। তাঁর দু-চোখের কোল-বেয়ে নেমে আসছে জল। এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ার সময়ও তিনি রবীন্দ্রসংগীত শুনে গেলেন। রবীন্দ্রগানকে ভালোবাসার এর চেয়ে বড়ো কোনো উদাহরণ আছে বলে আমার অন্তত জানা নেই।

এই কাব্যগ্রন্থে 'জনশ্রুতি' নামে একটি কবিতা আছে, তার দর্শন আবার একটু অন্যরকম।। তার দুটি পংক্তি হল—

মায়াবলে রোজ পিছোয় ঘড়ির কাঁটা—
জাদুকর মৃত, জীবন্ত রটনাটা।

যেহেতু ম্যাজিক ছিল প্রণবদার আকর্ষণের একটি বিষয়, আর সিনিয়র পি.সি. সরকারের ম্যাজিক শো তিনি নিজের চোখে দেখেছেন, তাই সেই জাদুকরকে নিয়ে টাউন হলের ঘড়ির সময় পিছিয়ে দেওয়ার সেই গল্প বা জনশ্রুতিটিও তাঁর অজানা ছিল না। আর মিথ হয়ে যাওয়া সেই গল্পটি এখনও পর্যন্ত লোকের মুখে-মুখে তো জীবন্তই হয়ে আছে—যখন কিনা জাদুকরের মৃত্যু ঘটেছে বহু বছর আগেই। মানে, জনশ্রুতির আয়ু যে মানুষের আয়ুর থেকে অনেক বেশি—এই আশ্চর্য কথাটি তিনি নিজস্ব ঢঙে তুলে ধরেছেন তাঁর এই কবিতায়।

প্রণবকুমারের কবিতার আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল স্মৃতিরোমন্থন। বিশেষ করে পুরোনো বন্ধু বা ঘনিষ্ঠ মানুষদের স্মৃতি নিয়ে লেখা কবিতায় আশ্চর্য দক্ষটা ছিল তাঁর। এই বইটিতে জর্জ বিশ্বাস, ভাস্কর চক্রবর্তী, গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত বা সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে কবিতা রয়েছে। সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে লেখা কবিতাটির নাম ‘নেই রাস্তা’। যার কয়েকটি পংক্তি আপনাদের একটু বলি—

সারাটা সকাল একইভাবে স্থির কলমের ছিপ কাগজে ডুবিয়ে,
সে-ও নেই আজ, বই হয়ে গেছে কোন্ ফাঁকে যেন বইয়ের তাকেই।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মৎস্যশিকারের গল্পগুলি নানা লেখকের, বিশেষ করে সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের গদ্যে আজ সত্যিই মিথে পরিণত হয়েছে। প্রণবকুমারের এই কবিতাতেও ছুটির দুপুর-বিকেল জুড়ে ইজারা নেওয়া কোনো পুকুরের পাড়ে তাঁর ছিপ

হাতে মাছের প্রতীক্ষায় ঠায় বসে থাকার উল্লেখ আছে। কিন্তু ওপরের দুটি পংক্তিতে তিনি যে ছবিটি এঁকেছেন তা হল, সারাটা সকাল ধরে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কোনো লেখা বা কবিতার প্রতীক্ষায়, সাদা কাগজের ওপর কলম ধরে বসে থাকার ছবি। এই যে সাদা পাতাকে একটা পুকুর হিসেবে দেখা আর সেই পুকুরের মাছের সঙ্গে কবিতার তুলনা করা, যে মাছ হুট বললেই টোপ খায় না বা ছিপে ওঠে না—যার জন্যে ছিপ নামক কলমটি হাতে ধরে স্থির হয়ে ধৈর্য ধরে বসে থাকতে হয় বহুক্ষণ—তা সত্যিই অনন্য এবং সেখানেই তিনি কবি প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়।

একেবারে শেষ বইটির বিভিন্ন কবিতার কথা বলতে গিয়ে, তাঁর প্রথম বই *অতলান্ত*-র দুটি কবিতাকে নিয়ে একটি মধুর স্মৃতির কথা মনে পড়ে গেল। তখন তাঁর বাড়িতে কাব্যসমগ্রের কাজ পুরোদমে চলছে। একদিন বেশ খুঁটিয়ে পড়তে গিয়ে ওই বইয়ের দুটি কবিতায় আমার চোখ আটকে গেল। যার প্রথমটির নাম 'বৈশাখী'। কবিতার প্রথম লাইনটি হল: "কী দিলে আমাকে তুমি! ইন্দ্রনীল শ্রাবণী সন্ধ্যায়"। আবার এই বইতেই 'আকাশ হৃদয়' নামে একটি কবিতা আছে। যার শেষের দিকের একটি লাইন হল: "শ্রাবণী মল্লারে, মেঘে, হিমছায়া শিশির-প্রহরে,"। একই বইয়ের দুটি কবিতায় 'শ্রাবণী' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। শ্রাবণ একটি সাধারণ শব্দ। এর ব্যবহারও প্রচুর। কিন্তু 'শ্রাবণী' শব্দ হিসেবে একটু দুর্লভ, বিশেষ করে কবিতায়। আমি জানতাম, প্রণবদার স্ত্রীর নাম ছিল শ্রাবণী। কিন্তু প্রণবদা তো বিয়ে করেছিলেন এ-বই বেরনোর কমবেশি বারো বছর পরে, ১৯৬৭-তে। প্রণবদার মুখ থেকেই শোনা—বঙ্গ সংস্কৃতি

সম্মেলনের এক অনুষ্ঠানে উনি শ্রাবণীবউদিকে গান গাইতে শোনেন। বউদির গানের গলা ছিল ভারী সুন্দর। উনি ছিলেন শৈলজারঞ্জন মজুমদারের ছাত্রী। তারপর দুই বাড়ির মধ্যে কথা হয়ে ওঁদের দুজনের বিয়ে ঠিক হয়েছিল। প্রণবদা যদিও এটাকে প্রেমের বিয়ে বলতেই বেশি পছন্দ করতেন। কিন্তু ১৯৫৫-তে 'কৃত্তিবাস' থেকে যখন 'অতলান্ত' প্রকাশিত হয় তখন তাঁর বয়স সবে সতেরো। তখন শ্রাবণীবউদি কোথায়? কিন্তু আমি তো প্রণবদাকে ছাড়ব না। আমার দাবি, সেই সময় থেকেই উনি বউদির সঙ্গে প্রেম করতেন, তাই ওই কবিতা দু-টিতে 'শ্রাবণী' কথাটি এসেছে। শুনেই তো সেই সুভদ্র, ফর্সা মানুষটির কান-গাল সব টকটকে লাল হয়ে গেল। বড়ো-বড়ো জ্বলজ্বলে চোখ দুটো আরও বড়ো-বড়ো করে, আর মুখে এক আশ্চর্য অসহায় হাসি নিয়ে, উনি আমায় প্রায় পনেরো মিনিট ধরে প্রাণপণে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন যে, এটা সেরকম কিছু ছিল না—দু-টি কবিতার মধ্যেই খুব স্বাভাবিকভাবে শব্দটি নাকি ঢুকে পড়েছিল।

প্রণবদা আমার চেয়ে কমবেশি সাঁইত্রিশ বছরের বড়ো ছিলেন। শুধু কবিতাকে কেন্দ্র করে এমন মধুর ইয়ার্কি মারার মতো বন্ধু আমি এ-জীবনে কি আর সত্যিই পাব?

কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কবি প্রণবকুমার

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কবি প্রণবকুমার

একলাস্ত

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়
অপেক্ষার রঙ

জল, তবু দগ্ধ-করা
প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

শো-কেসের ফুলবাবু
প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়
এত মায়া, এত মোহ

কেমন আছে এই পৃথিবী
প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

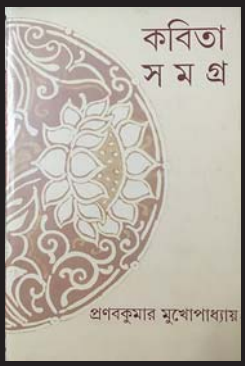
কবিতা
স ম গ্র
প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

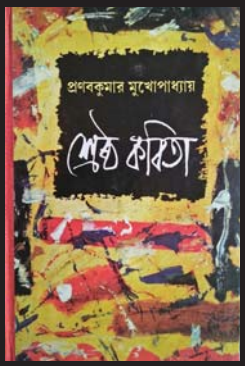
প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়
শ্রেষ্ঠ কবিতা